পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে
২ ডিসেম্বর ২০০৫

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে
২ ডিসেম্বর ২০০৫

তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ॥ ২ ডিসেম্বর ২০০৫

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক ২ ডিসেম্বর ২০০৫ জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ৩০.০০ টাকা

Parbatya Chattagramer Chukti Bastabayan Prasange ॥ 2 December 2005

published by Information and Publicity Department of Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti (PCJSS) on 2 December 2004 from its Central Office, Kalyanpur, Rangamati, Chittagong Hill Tracts, Bangladesh.

Telefax: +880-351-61248

E-mail: pcjss.org@gmail.com, pcjss@hotmail.com, Website: www.pcjss.org

Price : Tk. 30.00 only

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

পৃষ্ঠা ১-৪৫

আলোচনা সভা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৭ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ আদিবাসী অধিকার আন্দোলন এবং বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সহযোগিতায় জনসংহতি সমিতি কর্তৃক ২ ডিসেম্বর ২০০৪ ঢাকার হোটেল রিগ্‌স-এ আয়োজিত আলোচনা সভার সম্মানিত আলোচকবৃন্দের প্রবন্ধ ও ভাষণ

পৃষ্ঠা ৪৭-৭৫

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের উপর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সমিতির প্রতিবেদন

পৃষ্ঠা ৭৭-৮৮

বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি

সম্পাদকীয়

পার্বত্য চট্টগ্রামের এক চরম নাজুক পরিস্থিতিতে আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৮ম বর্ষপূর্তি অতিক্রান্ত হতে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মূল লক্ষ্য ছিল দেশের সংবিধান অনুসরণে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা রাজনৈতিক সমাধান করা অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ শাসনব্যবস্থা কায়েম করা, গণতান্ত্রিক সুশাসন প্রতিষ্ঠা, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটেলার বাঙালী ও ভূমি সমস্যা নিষ্পত্তি, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও স্থায়ী বাঙালীসহ সকল অধিবাসীদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে আজ সেসকল সম্ভাবনার দ্বার নস্যাৎ হতে চলেছে। বর্তমান সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। উপরন্তু বর্তমান চার দলীয় জোট সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে নানাভাবে পদদলিত করে চলেছে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার মর্যাদা চিরতরে ক্ষুন্ন করার পাঁয়তারা চলছে। অতি সম্প্রতি স্বার্থান্বেষী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী আরো নতুন ২৮,০০০ বহিরাগত বাঙালী পরিবারকে রেশন প্রদান ও ১০,০০০ বহিরাগত বাঙালী পরিবারকে সাজেক এলাকায় পুনর্বাসনের ষড়যন্ত্র অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের স্বার্থ পরিপন্থী মহল বর্তমান জোট সরকারের আমলে অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগত অনুপ্রবেশ ও ভূমি জবরদখল, পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন কাঠামো অকার্যকরকরণ, বহিরাগত সেটেলার বাঙালীদের বসতি প্রদান করে ভোটার বৃদ্ধিকরণ, সেনাশাসন অব্যাহত রাখা, পাহাড়ী ও স্থায়ী বাঙালী অধিবাসীদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন, হত্যা, জেল-জুলুম ইত্যাদি জোরদার হয়ে উঠেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বেকারত্বের সুযোগে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি বৃদ্ধি পেছেছে।

অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় বর্তমানে জনসংহতি সমিতির সদস্য-সমর্থকসহ সাধারণ মানুষের উপর সেনা নিপীড়ন-নির্যাতন চরম আকার ধারন করেছে। নানা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যেমন- কখনো মিথ্যা মামলা দায়ের করে, কখনো অস্ত্র ধরিয়ে দিয়ে গ্রেপ্তার করে, কখনো তথাকথিত সমঅধিকার সদস্যদের লেলিয়ে দিয়ে, কখনো ইউপিডিএফ নামধারী চুক্তি বিরোধী সন্ত্রাসীদের সশস্ত্র হামলার মাধ্যমে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে। রাজনৈতিকভাবে প্রত্যাখ্যাত হলেও স্বার্থান্বেষী কায়েমী সাম্প্রদায়িক শক্তির মদদে পার্বত্য চট্টগ্রামের কতিপয় এলাকায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতামূলক ভূমিকার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামিক জঙ্গীদের আস্তানা ও সন্ত্রাস সম্প্রসারিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে উগ্র সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা ও সেনাশাসনের সুযোগে ইসলামী জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামে ঘাঁটি গড়ে তুলছে; এমনকি প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র-গোলাবারুদ ইত্যাদির উৎস হিসেবে ব্যবহার করছে। এ পরিস্থিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীসহ সারাদেশের জন্য চরম হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় ইসলামী জঙ্গি তৎপরতা ও উগ্র সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধকল্পে এবং সেনাশাসন 'অপারেশন উত্তরণ' ও অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জোরদার সংগ্রামে অধিকতর পরিমাণে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী-বাঙালী স্থায়ী অধিবাসী এবং দেশের সকল গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল শক্তিকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবীতে

আলোচলা সভা

হোটেল রিগস ইন, ঢাকা, ২ ডিসেম্বর ২০০৪

২ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সত্বর বাস্তবায়নের দাবীতে ঢাকার হোটেল রিগস ইন-এ বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ও জনসংহতি সমিতির যৌথ উদ্যোগে অর্ধদিবসব্যাপী এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ আলোচনা সভায় জনসংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা সভাপতিত্ব করেন। আলোচনা সভাটি পরিচালনা করেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং। উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন-

১. ড. কামাল হোসেন, সভাপতি, বাংলাদেশ গণফোরাম;
২. রবীন্দ্রনাথ সরেন, সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ;
৩. মণিস্বপন দেওয়ান, উপমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৪. গোলাম মোর্তুজা, নির্বাহী সম্পাদক, সাপ্তাহিক ২০০০
৫. রোকেয়া কবীর, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সঙ্ঘ;
৬. হাসানুল হক ইনু, সভাপতি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল;
৭. এ্যাডভোকেট নিজামুল হক নাসিম, বিশিষ্ট আইনজীবী;
৮. দিলীপ বড়ুয়া, সভাপতি, বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল;
৯. ইউসুফ আলম, সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আদি ও স্থায়ী বাঙালী কল্যাণ পরিষদ
১০. অধ্যাপক এইচ কে এস আরেফীন, নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;
১১. অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ, বিশিষ্ট লেখক;
১২. হায়দার আকবর খান রনো, পলিটব্যুরো সদস্য, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি;
১৩. পঙ্কজ ভট্টাচার্য, প্রেসিডিয়াম সদস্য, বাংলাদেশ গণফোরাম;
১৪. মামুনুর রশীদ, বিশিষ্ট্য নাট্যকার
১৫. ফজলে হোসেন বাদশা, পলিটব্যুরো সদস্য, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি
১৬. মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি;
১৭. তোফায়েল আহমেদ, প্রেসিডিয়াম সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ;
১৮. রাজেকুজ্জামান রতন, বর্ধিত সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল
১৯. রাশেদ খান মেনন, সভাপতি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি;
২০. জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

সম্মানিত আলোচকবৃন্দের বক্তব্য পত্রস্থ করা হলো।

ড. কামাল হোসেন, সভাপতি, গণফোরাম

মঞ্চে উপবিষ্ট নেতৃবৃন্দ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী মনিস্বপন দেওয়ান, উপস্থিত জুম্ম জনগণের ভাই ও বোনেরা। আজকে আমি অভিনন্দন জানাতে চাই যে, বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আপনাদের পক্ষে সন্তু বাবু আপনাদেরকে নিয়ে শান্তি চুক্তি করেছিলেন, এটা কিন্তু আজকে সারা জাতির অর্জন হিসেবে আমরা সবাই গর্ববোধ করতে পারি। যে মহা সংকট সৃষ্টি হয়েছিল, অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করেছিল দেশের জন্য সকল মানুষের জন্য তা নিরসনকল্পে পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। মহৎ লক্ষ্য নিয়ে সকলে মিলে এই চুক্তি হয়েছিল। এটা একটি জাতীয় অর্জন। এটা কেবল জুম্ম জনগণের স্বার্থে না, এটা ১৫ কোটি মানুষের স্বার্থে এই চুক্তি হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, শান্তিচুক্তির ৭ বছর পরও আজ সেই চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি।

দেশের শান্তি সকলে চায়। সকল সুস্থ মানুষ তা চায়। দেশের অধিকাংশ মানুষ সুস্থ। কারা শান্তি চুক্তিকে বাধা দিয়ে আসছে ও কালক্ষেপণ করে চলেছে, এদেরকে চিহ্নিত আমরা করেছি। সবাই মিলে তাদেরকে চিহ্নিত করা দরকার। এরা জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী কাজ করে যাচ্ছে। আজকের স্বাধীরতার ৩২ বছর পর আমরা ৭ বছরের শান্তি চুক্তির কথা বলছি। আমার কথা হলো স্বাধীনতার ৩২ বছর পরে, সংবিধান ৩২ বছর হওয়ার পরেও ১৫ কোটি মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা এখনও পুরণ হয়নি।

আজকে মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নেই। আজকে সন্ত্রাসীদের হাতে মানুষের জীবন দিতে হচ্ছে। আজকের কোবরা-চিতাদের হাতে আমাদের জীবন দিতে হচ্ছে। আইনের চোখে এভাবে জীবন হারানোর কথা না। একজন অপরাধী হলেও তাকে বিনাবিচারে মৃত্যুদন্ড দেওয়া যায় না। এটা আমাদের সংবিধানের বিধান। আজকে কেন আমাদের এই অবস্থার মুখোমুখী হতে হচ্ছে? কতিপয় অসুস্থ মানুষের সীমাহীন লোভ, ক্ষমতা লোভ, সম্পদের লোভ, ব্যক্তি স্বার্থের কারণে এসব কিছু হচ্ছে।

আমার শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু সন্তু লারমার সাথে যখন আমি মনখুলে কথা বলেছি, আমি দেখেছি আমাদের মধ্যে একটা ঐক্যমত আসতে বেশী সময় লাগে না। উনি ন্যায়ের পক্ষে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, সকলের অধিকারের পক্ষে, ন্যায়সঙ্গত দাবির পক্ষে। আজকে যদি আমরা মূল্যায়ণ করি, দেশে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার সেই একই ধরনের অসুস্থ মানুষের অসুস্থ চিন্তাধারা, অসুস্থ রাজনীতি বিরাজ করছে এবং এর ফলে দেশে ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সংকট এখনও নিরসন হয় নাই।

শান্তি চুক্তি সম্পাদন করা একটা সাহসী কাজ ছিল। সেজন্য যখনি সুযোগ পাই আমি অভিনন্দন জানাই। এই শান্তিচুক্তির জন্য আজ আমরা এখানে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। একটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে একটা স্থায়ী সমাধান করার লক্ষ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সারাদেশের স্বার্থে, দেশের সার্বিক উন্নতি ও ১৫ কোটি মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পূর্বশর্ত এই শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন। শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি ও অধিকার পাবে। সংবিধানে সেই অধিকার দেয়া আছে। শান্তিচুক্তিতে চিহ্নিত করা হয়েছে সেখানকার বিশেষ অবস্থা, স্বাতন্ত্র ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তাদের সেই অধিকার তারা যাতে ভোগ করতে পারে সেই বিশেষ বিধান করা হয়েছে। এটা সংবিধানের দৃষ্টিতে নাগরিকের পূর্ণ অধিকার ভোগ করার লক্ষ্যে এই বিশেষ বিধান করা হয়েছে। এই অঞ্চলের মানুষ যাতে তাদের অধিকার ভোগ করতে পারে, একটা সুশাসন নিশ্চিত করা যায়।

বাংলাদেশের কোন জায়গায় জনগণকে অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই দেখি দেশের সকলে অধিকার থেকে বঞ্চিত। আজকে উপস্থিত ভাই-বোনদের বলতে চাই যে, আজকে যদি জনমত যাচাই করি, তাহলে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ৯৯ ভাগ মানুষ বলবে যে আমরা শান্তি চাই। দেশে একভাগের কম আছে যারা কায়েমী স্বার্থবাদী ও তাদের নিজস্ব

স্বার্থ ছাড়া কিছুই বোঝে না। কতিপয় লোক তাদের সীমাহীন লোভ, সম্পদের জন্য যেনতেন প্রকারে ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য বৃহত্তর স্বার্থকে বিসর্জন দিয়েছে।

আমরা এ বছর সন্তু বাবুসহ সবাই মিলে পল্টনে ঐক্যমঞ্চ গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। এই ঐক্যমঞ্চ কোন বিশেষ দলের জন্য নয়, ১৫ কোটি মানুষের জন্য। আমি আন্তরিকভাবে মনে করি সন্তু বাবু শুধু জুম্ম জনগণের নেতা না, তিনি বাংলাদেশের নেতা। আমি যদি ৫ জন নেতাকে শ্রদ্ধা করি, তার মধ্যে উনি একজন। উনি বাংলাদেশের একজন শ্রদ্ধাভাজন নেতা। কেননা তিনি সৎ, নীতিবান, বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ঝুঁকি নিয়েছেন। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে। মানুষ নেতা-নেত্রীদের কাছ থেকে এটাই আশা করে। যে সকল নেতা-নেত্রী যারা ব্যক্তি স্বার্থকে বড় করে দেখে, জাতীয় স্বার্থকে বিজর্সন দেয়, তাদেরকে আমি মহান বলতে পারি না। তাই নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে, জনগণের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করে, কাজ করে ঝুঁকি নেয় তাকে আমরা মহান নেতা মনে করি এবং আপনারা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে, জুম্ম জনগণের সন্তু বাবু এবং অন্যন্যরা যারা তার সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন তাদেরকে পেয়েছেন।

উনার মৃত ভাই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে আমি স্মরণ করি। তিনি অত্যন্ত বড় মাপের মানুষ। আমার এখনও মনে পড়ে, যখনই উনাকে বলা হয়েছিল আপনি মন্ত্রী হয়ে যান। উনি বলেছিলেন, মন্ত্রী হওয়ার জন্য আমি রাজনীতি করি না। এই নীতিতে যদি আমরা সবাই অবিচল থাকতে পারতাম যে, যেনতেন প্রকারে মন্ত্রীত্ব রাখার জন্য নীতি বিসর্জন দেওয়া যায় না। জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া যায় না। জাতীয় নিরাপত্তা বিসর্জন দেওয়া যায় না। আইনের শাসনকে ধ্বংস করা যায় না। এই কয়েকটি ব্যাপারে বৃহত্তর স্বার্থে, ১৫ কোটি মানুষের স্বার্থে সকলেই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন আছে। তেমনি আজকে পার্বত্য শান্তি চুক্তি অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হলো জাতীয় নিরাপত্তার পূর্বশর্ত। এটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা যাবে না। যারা করছে তারা জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছে। তারা জাতীয় পরিপন্থী কাজ করছে।

এই শান্তিচুক্তি আমাদের অর্জন। এটা আমরা হারাবো না। যে কোন মূল্যে আমরা এই চুক্তি রক্ষা করবো। যারা বলে শান্তিচুক্তিকে বাতিল করো তাদেরকে দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। কারা বলে একথা? একজনের নাম আমি জানি। আমি তার নাম উচ্চারণ করতে চাই না। সে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপমন্ত্রীকে অবরোধ করে। আমি উপমন্ত্রী সাহেবকে বলেছি, প্রাইম মিনিষ্টারকে বলেছি, পংকজ বাবুসহ আমাকে অবরোধ করে ঠিক আছে। আমাদের কোন মূল্য নেই। যদিও একজন নাগরিক হিসেবে, একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তি হিসেবে আমার মানবধিকার আছে যে, বাংলাদেশের সকল অঞ্চলে আমার যাওয়ার অধিকার আছে। অথচ এই সরকারের মাননীয় সংসদ সদস্য পঙ্কজ বাবুসহ আমাকে অবরুদ্ধ করে। (গত ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ রাঙ্গামাটিতে জনসংহতি সমিতির পূর্ব ঘোষিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদানের জন্য ঢাকা থেকে আসার পথে গণফোরাম সভাপতি ও বরেণ্য আইনজীবি ডঃ কামাল হোসেন এবং তাঁর সফরসঙ্গীদের উপর চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা সীমান্তে কাউখালী উপজেলাধীন রাবার বাগান এলাকায় চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি সড়কে আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার মদদে সমঅধিকার আন্দোলনের একদল সন্ত্রাসী প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে হামলা চালায়। - তথ্য ও প্রচার বিভাগ)।

আমাদের মানবাধিকার সেখানে নাখোশ করা হলো। এর বিরুদ্ধে কোন একশন নেওয়া হয়েছে? না হয়নি। আমাকে যখন পুলিশ ফোন করে বলে যে, এই ব্যাপারে তারা ২/১টা গরীবের ছেলে ধরেছে। আমি বলেছি তাদেরকে বাদ দেন, ছেড়ে দেন। আমার এফআইআরে আমি যার নাম ১ নম্বর দিয়েছি তাকে ধরেন। পুলিশ বলেন যে, স্যার আমরা তো ছোট লোক। আমরা কি করতে পারি? আমার মতো মন্ত্রী সাহেবকেও একই জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে। উনাকে উনার এলাকা থেকে অবরোধ করলো। তার বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোন একশন নেয়নি। দেশে কোন আইন আছে? দেশে কোন সংবিধান

আছে? সভ্যতা আছে? আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে জবাব চাই। আর কারোর কাছে না, কারণ উনি রাষ্ট্রীয় সরকার প্রধান। তার জবাব দিতে হবে। আজকে হোক কালকে হোক ১৫ কোটির মানুষের কাছে তার জবাব দিতে হবে। তার মন্ত্রীকে অবরুদ্ধ করা হয় কি করে? সেকি আইনের উর্ধ্বে? সংবিধানের উর্ধ্বে? কোন বৃহৎ শক্তি তার পেছনে আছে? কোন বিদেশী শক্তি তার পেছনে আছে যে, তাকে সব কিছুর উর্ধ্বে রেখে এভাবে আপনার মন্ত্রীকে অপমান করার সাহস দিচ্ছে? আর আমরা সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছি?

এই হলো দেশের বাস্তবতা। আমি মনে করি যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন বা লোকেল গভর্ণমেন্ট যেটা হবে সেটা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে হতে হবে। পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন হচ্ছে না। আঞ্চলিক পরিষদও নির্বাচন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। জুম্ম জনগণ বঞ্চিত। দেশের ১৫ কোটি মানুষ বঞ্চিত। আসুন সবাই মিলে আন্দোলন করি যে, সংবিধানে নিশ্চিতকৃত আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন বা লোকেল গভর্ণমেন্ট নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে হতে হবে। সেখানে আমলাদের নিয়ন্ত্রনে আমরা চালাবো না। আমলাদের নিয়ন্ত্রণে হলে স্বাধীনতার অর্থ সেখানে কিছু থাকে না। স্বাধীন দেশে এভাবে হওয়ার কথা না।

বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের ব্যাপারে ২০ বার সময় নিয়ে সেখানে কালক্ষেপণ করা হচ্ছে। ক্ষমতা, দূর্নীতি, সন্ত্রাস, উগ্র-সম্প্রদায়িকতার রোগে আক্রান্ত অসুস্থ শাসকদের কাছ থেকে সুশাসন আশা করা যায় না। তারা সংবিধানকে মেনে চলে না। এর উপায় কি? এর প্রতিকার কি? আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশে অর্থপূর্ণ পরিবর্তন আনি। আমরা বাংলাদেশের মানুষ ৩২ বছর ধরে অপেক্ষা করেছি, স্বাধীনতার যে প্রতিশ্রুতি ছিল আমরা সবাই আমাদের মানবাধিকার আমরা ভোগ করবো।

আমরা সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর ভূমিকায় দেখতে চাই। শুধু আপনাদের আঞ্চলিক পরিষদ নয়, আমাদের সংসদও কি আমরা কার্যকর পেয়েছি? কোরাম হয় না। মহামান্য ব্যক্তিদেরকে সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। আপনাদের আঞ্চলিক পরিষদের ন্যায় কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে একটা সংসদ করা হয়েছে সেটাও কোন কাজের সংসদ না। অর্থাৎ আমরা আপনাদের সঙ্গে অন্তর থেকে ১০০ ভাগ সঙ্গতি প্রকাশ করছি। আপনারাও বাংলাদেশের বঞ্চিত মানুষের মধ্যে রয়েছেন।

আপনারাও সবাই মিলে আসুন, ১৫ কোটি মানুষ অসন্তোষ-বঞ্চনার মধ্যে ভূগছে। জুম্ম জনগণও চুক্তি করার পরেও তারা বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের অসন্তোষ ও সংগ্রামের প্রতি আমি পুরোপুরি একাত্মা ঘোষণা করছি। আজকে আমি উৎসাহিত হচ্ছি যে, গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে যারা প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন, আপোষহীনভাবে লড়াই করে আসছেন সকলকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি।

গত ১৪ মার্চ এক্যমঞ্চে অনেককে পেয়েছিলাম। প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ঐক্য প্রয়াস এগোচ্ছে। আমি আশার আলো দেখছি, মানুষের মধ্যে জাগরণ এসেছে। আপনাদের নীতিবান নেতৃত্ব আমাদের একটা জাতীয় সম্পদ। এই নীতিবান নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে আপনারাই আশার আলো দেখছেন। দেশের মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে। ন্যায়ের পক্ষে শক্তভাবে দাঁড়ানো সেই শক্তিকে কেন্দ্র করে আমি বিশ্বাস করি আপনাদের ৭ বছর ধরে যে দাবি আর আমাদের ৩২ বছর আগে থেকে করে আসা দাবিগুলো আগামীতে ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে অক্ষরে অক্ষরে অর্জন করবো।

আমরা সবাই মিলে এই শপথ করবো যে, একবদ্ধভাবে যখন জনগণ এই দেশকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনবে তখন দাবী পূরণের ক্ষেত্রে আমরা আর কালক্ষেপণ করবো না। অতীতে আমিও এই রকম দায়িত্বে ছিলাম। আমি এখনও বলছি, আমি ৯ মাস আইন মন্ত্রী হয়ে আইনের পৃথকীকরণ করলাম না

কেন এটা আমার মনে দুঃখ আছে। ঐ ৯ মাসে এতগুলো কাজ ছিল যে ঐ কাজটা আমার হাত দিয়ে হয় নাই। এখন আমি সবাইকে বলছি যে, আগামীতে কেউ যদি ক্ষমতায় যান আমি হাতে পায়ে ধরে বলছি আপনারা কেউ কালক্ষেপণ করবেন না, যে প্রতিশ্রুতি জনগণকে দেওয়া হয়েছে সেটা পালন করতে একটা মিনিটও যেন আমরা দেরী না করি। জনগণ একদিন অবশ্যই ক্ষমতায় যাবে। এত ত্যাগ এত মূল্য সবাই মিলে আমরা দিয়েছি, জনগণের ক্ষমতা জনগণের হাতে নিতে হবে। কিন্তু এবার ক্ষমতা নিয়ে যেন এদিক ঐদিক কালক্ষেপণ না করি। জনগণকে আমরা যে কথা দিয়েছি সে কথা রাখার জন্য আমরা যে কোন মূল্য দেবো- এই শপথ নিয়ে আমরা আন্দোলনের মধ্যে আছি। আন্দোলনের একটা বিরাট অংশ হিসেবে আজকের এই অনুষ্ঠানে আমি অংশগ্রহণ করছি।

আমার আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই আপনাদের এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। সন্তু বাবুকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই এই উদ্যোগের জন্য। আপনাকে যখন পাশে পাই অনেক মনের জোর পাই যে, একজন নীতিবান মানুষকে সঙ্গে পাচ্ছি। এই শক্তি নিয়ে আপনাদের সকলের সম্মিলিত শক্তি আমাদেরকে শক্তি যোগাবে। এই দেশের জনগণের মুক্তি, দেশের সকল মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার লক্ষ্যে আসুন আমরা সবাই মিলে আপোষহীনভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাই। এই কথা বলে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

রবীন্দ্রনাথ সরেন, সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ

আজকের আলোচনা সভার মাননীয় সভাপতি, উপস্থিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ, উপস্থিত সুধীবৃন্দ এবং আদিবাসী ভাইবোনেরা। আমি জাতীয় আদিবাসী পরিষদের পক্ষ থেকে এবং বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকে শান্তি চুক্তির ৭ম বর্ষ দিবস হিসাবে পালিত হচ্ছে। অত্যন্ত দুঃখের সাথে আমরা লক্ষ্য করছি এবং বলতে চাই, সেটি হলো এদেশের জুম্ম জনগণসহ বাংলাদেশের আদিবাসী যারা বছরের পর বছর থেকে বসবাস করছেন, জীবন জীবিকা নির্বাহ করছেন, সেই জাতিসত্ত্বা আজকে অত্যন্ত অবহেলিত, নির্যাতিত এবং লাঞ্ছিত হচ্ছে।

আমরা জানি যে, জুম্ম জনগণ তাদের সামাজিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘ সময় প্রায় দুই যুগ ধরে তারা লড়াই করেছেন, রক্ত দিয়েছেন, এদেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন, ধ্বংস হয়েছেন। বহু রক্তের বিনিময়ে এই শান্তি চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু সেটি বাস্তবায়ন হয়নি। কারণ আমার লক্ষ করি যে, এদেশের সরকার যারা ক্ষমতায় থাকেন, দেশশাসন করেন, পরিচালনা করেন, তারা আদিবাসীদের প্রতি পুরোপুরি আন্তরিক নয়। এটা আমরা লক্ষ করেছি, আর সেই কারণে আদিবাসীদের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে, প্রত্যেকটি বিষয়ে কোন অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। সে কারণে আমরা এদেশের আদিবাসীরা আমরা সবাই বুকভরা আশা নিয়ে আমরা লড়াই সংগ্রাম করতে করতে সামনে দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার জন্য তেমন নেতৃত্ব গড়ে উঠেনি। আজকের সেই নেতৃত্ব কিন্তু তৈরী হয়েছে। আজকে আদিবাসীরা সন্তু লারমার মত একজন বলিষ্ট নেতা পেয়েছে। সমগ্র আদিবাসী বাংলাদেশের যে অঞ্চলে থকুক না কেন আমরা সবাই আদিবাসীদের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত আছি। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম গঠিত হয়েছে। আদিবাসী ফোরাম সমস্ত আদিবাসীকে এক জায়গায় নিয়ে ঐক্যবদ্ধ করেছে।

আদিবাসীদের যে সম্পদ ছিল, সে সম্পদ আজ নাই। তাদের সম্পদ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। শুধু জুম্ম জনগণ কেন, আমরা যদি তাকাই উত্তরবঙ্গে সমতল আদিবাসীদের অবস্থা, আমরা যদি তাকাই সিলেট-ময়মনসিংহের আদিবাসীদের দিকে, তাহলে দেখতে পাই আজকে তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

উচ্ছেদ করা হচ্ছে। নারী নির্যাতন-লাঞ্ছনা তো আছেই, হত্যা-গুম হচ্ছে। এই হচ্ছে ভয়াবহ অবস্থা। অর্থাৎ আমরা আদিবাসীরা এখন ভাবতে পারছি না যে, এদেশের সরকার, এদেশে যারা শাসন করে তারা এই জাতিসত্ত্বাকে রক্ষা করবে কিনা? এই জাতিসত্ত্বাকে বাংলাদেশে থাকতে দেবে কিনা? তারা থাকতে পারবে কিনা এটা আমাদের প্রশ্ন। কারণ এদেশে আমরা স্বাধীনতার লড়াই করেছি, রক্ত দিয়েছি, জীবন দিয়েছি, প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সামিল হয়েছি। স্বাধীনতার যুদ্ধ বলুন, মুক্তিযুদ্ধ বলুন, ভাষা আন্দোলনের কথা বলুন সব আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু আজকে আদিবাসীদের অবস্থা কি?

আমার মনে হয়েছে যে, এদেশ থেকে আদিবাসীদের মেরে ফেলার একটি গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। আজকের মিথ্যা মামলার মাধ্যমে, বনায়নের নামে বিতাড়ন, ইকো পার্কের নামে আদিবাসীদের গ্রাম উচ্ছেদ চলছে। চাকুরী থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আদিবাসীরা কোন স্থান পাচ্ছে না। সে কারণে আমি আহ্বান জানাত চাই আদিবাসীদের সাথে সাথে আদিবাসীদের যারা ভালবাসেন, আদিবাসী সংগ্রামকে যারা এগিয়ে নিতে চান, তাদের কাছে আমাদের দাবি আসুন এই অসহায় জাতিগোষ্ঠীকে, আদিবাসী অস্তিত্বকে আমরা রক্ষা করি। আমি আপনাদের সহযোগিতা চাই। আপনাদের কাছে আহ্বান রাখতে চাচ্ছি এখন আদিবাসীরা কি করবে? যদি এদেশের সরকার তাদের অধিকার বাস্তবায়ন না করে তাহলে আমরা কি করবো? আমাদের রাস্তা কি?

আমাদের রাস্তা খুঁজতে হবে। আমরা আবার লড়াই করবো আমাদের অধিকারের জন্যই? লড়াই করতে হবে কিনা আমাদের? সংবিধানে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে সকল নাগরিকের সমান অধিকার দিতে হবে। তাহলে এই অধিকার আমরা কিভাবে পাবো? আমাদের অবশ্যই একটা পথ খুঁজে বের করতে হবে। আজকের পথ হচ্ছে লড়াই সংগ্রামের পথ। এই লড়াই সংগ্রামের পথে, গণতন্ত্রমনা রাজনৈতিক দল, মানুষকে আমাদের সাথে পাবো বলে বিশ্বাস। সাথে সাথে এই সভা থেকে জোর দাবি জানাচ্ছি, অনতিবিলম্বে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন করা হোক, করতে হবে। ধন্যবাদ সবাইকে।

মণিস্বপন দেওয়ান, উপমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আজকে শান্তিচুক্তির ৭ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সম্মানিত সভাপতি জনসংহতি সমিতির মাননীয় সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, মঞ্চে উপবিষ্ট বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শ্রদ্ধাভাজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ববর্গ, বিভিন্ন এলাকা থেকে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বন্ধু ও বোনেরা, উপস্থিত ইলেকট্রোনিক মিডিয়া ও প্রেস মিডিয়ার সাংবাদিক বন্ধুরা, সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমাদের সরকারের মন্ত্রীরা এই আলোচনা সভায় আসলে ভাল হতো কিন্তু সকলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বললে একটু ঘাবড়ে যায়। কারণ এত জটিল এই সমস্যাটা এটা নিয়ে মনে হয় আলোচনা করার জন্য তারা যেমন সাহস পান না, আগ্রহ থাকে না, কিন্তু সকলে এটাকে এড়িয়ে যেতে পারলেও আমি তো পারি না। যে কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে কাজ করছি। তাছাড়া এই পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হয়েছে এই চুক্তির আলোকে। সুতরাং চুক্তির কারণে যেটা সৃষ্টি হয়েছে সেই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব আমি পালন করছি বিধায় আমাকে তো আসতে হবে। যত রকমের পরিস্থিতি সৃষ্টি হোক না কেন আমাকে সেটার জবাবদিহিতা কিছুটা করতে হয় বৈকি? আর সে কারণেই আমার আসা।

আমি মনে করি যে, পার্বত্য শান্তিচুক্তির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যদি আমরা ব্যাখ্যা করতে চাই, তাহলে সেটা দেখতে হবে কোন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করবো? সেটা পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক অবস্থা থেকে মূল্যায়ণ করবো? নাকি বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের আলোকে ব্যাখ্যা করবো? নাকি

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে এটা মূল্যায়ন করবো? সুতরাং আমি মনে করি আজকে সব কিছুতেই top to bottom, bottom to top এই চিন্তা ভাবনাই হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে আবার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে থেকেও পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান থেকে মূল্যায়ণ করতে হবে। এ কারণে আমি বলবো যে, ৭ বছর হয়েছে চুক্তি স্বাক্ষরের পর, কিন্তু এই চুক্তিটা বাস্তবায়ন হয়নি কেন? হচ্ছে না কেন? দীর্ঘ দুই যুগ আন্দোলন সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় চুক্তিটা সম্পাদিত হয়েছে এবং তারই ধারাবাহিকতায় বাস্তবায়নের জন্য সেই দায়িত্বটা অনেকটা আমার উপর দায়িত্বে পড়েছে।

বস্তুতঃ এই চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এককভাবে কোন মন্ত্রণালয়ের বা ব্যক্তির উপর নির্ভর করে না। এটা সকলের সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। আমরা যারা রাজনীতিবিদ সরকারীর দলের বলুন বিরোধী দলের বলুন, যারা মেম্বার অফ দি পার্লামেন্টে আছি, যারা নীতি নির্ধারক, তাদের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে কতটুকু স্বচ্ছ ধারণা আছে আগে এই প্রশ্নের মীমাংসা সবচেয়ে বড়। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক বিষয়ে, ওখানকার সামাজিক বিষয়ে, সাংস্কৃতিক বিষয়ে, অন্যান্য বিষয়ে যতক্ষণ না পর্যন্ত একটা পরিস্কার ধারণা থাকবে, ততক্ষণ আমাদের চিন্তার মধ্যে, কথাবার্তার মধ্যে একটি বিভ্রান্তি থাকবে, দ্বন্দ্ব-সংঘাত থাকবে। এ বিষয়ে রাজনীতিবিদদের ধারণা পরিস্কার নয় বিধায় অনেকে নিছক রাজনৈতিক করে থাকেন। যে কারণে এই পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা এখনও পর্যন্ত জিইয়ে আছে। এটা নিয়ে অনেকে ষড়যন্ত্র করার সুযোগ নিয়ে থাকেন।

আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে চাচ্ছি পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনব্যবস্থা একটা জটিল। যেখানে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এখনও বলবৎ আছে। এটার আলোকে জেলা প্রশাসক এখনো ভূমি সংক্রান্ত ও অন্যান্য অধিকার ভোগ করে থাকেন- যেটা অন্যান্য জেলা প্রশাসকদের মধ্যে নেই। তা ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথাগত নেতৃত্ব রয়েছে। সার্কেল চীফের নেতৃত্বে হেডম্যানরা আছেন যারা মৌজার নেতৃত্ব দেন। তাদের উপর শুধু সামাজিক দায়িত্ব নয়, ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে রেভিনিউ কালেকশনের দায়িত্ব রয়েছে। কনভেনশনাল উপায়ে ভূমি ব্যবহার হয়ে থাকে যেটা প্রথাগতভাবে চলে আসছে। সরকারী ভাষায় খাস জমি বলা হয়। কিন্তু আমরা আদিবাসীরা মনে করি এটা আমাদের কমিউনিটি সম্পদ। এটা আমাদের জন্মগত সম্পদ। এখানে হেডম্যানদের অনুমতি নিয়ে জুম চাষ বা বাগানবাগিচা করে থাকি। এটা এখনো পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ সেখানে শান্তিচুক্তির বলে আঞ্চলিক পরিষদ সৃষ্টি হয়েছে। পার্বত্য জেলা পরিষদ সৃষ্টি হয়েছে যেটা অন্যান্য জেলাগুলোতে নেই বা পার্বত্য জেলা পরিষদের মতো হস্তান্তরিত বিষয় বা প্রশাসনিক ক্ষমতা অন্যান্য সমতল জেলা পরিষদে নেই। আঞ্চলিক পরিষদ রয়েছে যা উপর তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব রয়েছে। এই আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয়েছে।

এই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে থেকে আমি কতটুকু অনুকুল পরিবেশে কাজ করতে পারছি সেটাও আরেকটা প্রশ্ন। এদেশে বর্তমানে যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিরাজ করছে এই রাজনৈতিক সংস্কৃতিরই অনেক ক্ষেত্রে ভিকটিম আমি। কারণ কেউ যদি কোন ভাল কাজ করে থাকে সেটার যেমন আমরা স্বীকৃতি দিই না তেমনি কেউ যদি খারাপ কাজ করে সেটারও দোষ স্বীকার করি না। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তিটা যাই হোক, আমি একজন শান্তিকামী মানুষ হিসেবে, ঐ এলাকায় বসবাস করি, আমি ঐ এলাকার সাংসদ, তাই আমার ব্যক্তিগত স্বার্থে এবং ঐ এলাকার জনগণের স্বার্থে আমি শান্তি চাই। একজন শান্তিকামী মানুষ হিসেবে আমি আমার ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করে থাকি।

অনেকে মনে করে থাকেন পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা কেবল পাহাড়ীদের। এই সমস্যাটা ঐ এলাকার পাহাড়ী-বাঙালীদের দ্বন্দ্ব। সমস্যাকে এভাবে চিহ্নিত করা হয়। ফলে এই সমস্যার প্রতি জাতীয় পর্যায়ে যতটুকু মনোনিবেশ বা আগ্রহ থাকা দরকার সেভাবে আমরা পাই না। তাই আমি মনে করি বাংলাদেশের যে সকল সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানের জন্য দেশের রাজনীতিবিদদের একটা ন্যূনতম ঐক্যমতে আসা দরকার। এ সরকারের পরে আরেকটা সরকার আসবে। কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের যদি ধারাবাহিকতা না থাকে তাহলে সমস্যা থেকেই যাবে। এর খেসারত ঐ এলাকার মানুষকে তো দিতেই হয়, গোটা জাতিকে দিতে হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা কেবল একক কোন সরকারের পক্ষে যেমন সমাধান দেয়া সম্ভব নয়, তেমনি পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়াও তা সম্ভব নয়। তাই এটাকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে আমাদের টিমওয়ার্ক করতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সম্পদ রয়েছে তা যদি যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারি তাহলে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে একটি ভালো যোগান দিতে পারবে। এর জন্য প্রয়োজন ঐ এলাকায় শান্তি স্থাপন করা এবং এটা কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য নয়, এটা দেশের ১৪ কোটি মানুষের জন্য প্রয়োজন। এলক্ষ্যে ন্যূনতম ঐক্যমতের ভিত্তিতে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্য আমাদের কাজ করে যাওয়া উচিৎ। শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে বিভিন্ন রকমের অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে এ আলোচনা সভার মাননীয় সভাপতি তথা জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন করে আসছেন। যেহেতু উনি চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন স্বাভাবিকভাবে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন সুতরাং তার অনুভূতি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বিশেষ করে আমরা যা কিছু হারিয়েছি তা কতটুকু পূর্বাবস্থায় নিয়ে আসা যাবে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। যে জায়গা-জমিগুলো হারিয়েছি, যে সমস্ত মানুষ নানাভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছে তাদেরকে কতটুকু পুনর্বাসন করা যাবে এগুলো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তবুও আমি বলবো সরকার কর্তৃক চুক্তি বাস্তবায়ন না করার উনার যে অভিযোগ, অনুযোগ বা ক্ষোভ রয়েছে এটা থাকার কথা। তার জায়গায় আমি যদি থাকতাম, এই চুক্তিটা যদি করতাম হয়তো সে রকম ভূমিকা আমারও হতো।

এখন কথাটা হচ্ছে আমরা যারা রাজনীতিতে জড়িত আছি বা সরকার পরিচালনা করছি বা যারা বিরোধীদলে আছি আমরা কতটুকু সেই দায়িত্বশীল নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করছি? দায়িত্বশীল নেতৃত্ব ছাড়া এগুলি সমাধান সম্ভব নয়। আমরা সবাই নেতৃত্ব দিচ্ছি। কেউ আঞ্চলিক পর্যায়ে, কেউ জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব দিচ্ছি। কিন্তু আমরা কতটুকু সৎ নিষ্ঠার সাথে সেই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছি? সেগুলোর উপর নির্ভর করছে চুক্তি বাস্তবায়ন।

আজকে আমি খোলাখুলিভাবে বলতে চাই যে, যদিও বিএনপি এবং তার শরিক দলগুলো ৯৭ সালে চুক্তির বিরোধীতা করেছিল এবং নির্বাচনী মেনুফেষ্টোতে উল্লেখ ছিল চুক্তিতে যদি সংবিধান পরিপন্থী কোন কিছু থাকে তা সংশোধন করবে, কিন্তু তিনটি বছর পার হওয়ার পরও সরকার এখনও ঐ শান্তি চুক্তিতে হাত লাগায়নি। হয়তো বা অভিযোগ করতে পারেন- কালক্ষেপণ হচ্ছে। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূইয়ার নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি হয়েছে। এই কমিটিতে আটবার মিটিং হয়েছে। এই মাসের মাঝামাঝি বা শেষান্তে আরেকবার মিটিং হবে। আমি আশাবাদী যে, আঞ্চলিক পরিষদের বিধিমালা প্রণীত হবে। এর প্রক্রিয়া প্রায় শেষ পর্যায়ে এসেছে।

দ্বিতীয়তঃ উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্ক ফোর্স পুনর্গঠন করা হয়েছে, প্রয়োজনীয় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সেই আলোকে এখন পর্যন্ত উপজাতীয় শরণার্থীদের রেশন দেয়া হচ্ছে। জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিরসনের জন্য ভুমি কমিশনের মেয়াদ ৩ বছর বাড়ানো হয়েছে।

আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু চিহ্নিত করে ও ভূমি সংক্রান্ত জটিলতাগুলো নিরসন করে পুনর্বাসনের জন্য যাতে সরকারকে সুপারিশ দিতে পারে, টাস্ক ফোর্সের উপর সেরকম একটা আদেশ দেয়া আছে।

ভূমি সংক্রান্ত বিষয় অত্যন্ত জটিল এবং এটা যাতে আর বাড়তে না পারে সরকার থেকে একটা ভালো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সেটা হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বন্দোবস্তি বন্ধ রাখা হয়েছে। ভূমি বন্দোবস্তী বন্ধ রাখার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ করা হয়েছে। ভূমি বন্দোবস্তি বন্ধ করা হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি নিয়ে। পাহাড়ীরাও বন্দোবস্তি পাচ্ছে না, বাঙ্গালীরাও পাচ্ছে না। তার কারণটা হচ্ছে প্রত্যেক সরকারের আমলে রাজনীতিবিদ, আমলা এবং কিছু সুবিধাবাদী লোক পার্বত্য চট্টগ্রামে একশত একর দুইশত একর করে বিভিন্ন প্রকল্পের নামে লিজ নিয়ে থাকেন। অথচ সাধারণ লোকের জন্য জমি বন্দোবস্তি দিতে পারছি না। আপনারা নিশ্চয় জানেন আমরা এর মধ্যে ১৪ জনের লীজ বাতিল করে দিয়েছি। এই ভূমি বন্দোবস্তি বন্ধ করার পিছনে একটি কারণ হলো ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা আর যাতে না বাড়ে।

ভূমি কমিশন কাজ করতে না পারার কারণে যে সমস্ত ভূমি বিরোধগুলো রয়েছে যেগুলো এখনও পর্যন্ত সমাধান হয়নি। নতুনভাবে যদি ভূমি বন্দোবস্তি প্রক্রিয়া চলে তাহলে সমস্যা আরো বেশি জটিল হবে এবং কোন সরকারের পক্ষে এ সমস্যা সমাধান করা কঠিন হয়ে পড়বে। সুতরাং আমি আমার অবস্থান থেকে চেষ্টা করছি পার্বত্য চট্টগ্রামে সমস্যাটা আরো যেন জটিল না হয় সেটা রোধ করা জন্য এবং অত্যন্ত সততা নিষ্ঠার সাথে সেই দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করছি যদিও বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহলের পরিবেষ্টিত হয়ে আমাকে সে কাজ করতে হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমি সেই দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করছি। পাশাপাশি আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতৃবৃন্দকে ও জাতীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করবো, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাটা রাজনৈতিক হিসেবে ব্যবহার না করে গঠনমূলকভাবে দেখে সমস্যা সমাধানে সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে। আমাদেরকে সৎ ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। এই সংকটটা কেবল জাতীয় পর্যায়ে নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামেও এই সংকট রয়েছে। তাই আমার একটাই আহ্বান যে, ঃযরহশ ষরশব ধ ষবধফবৎ, নবযধাব ষরশব ধ ষবধফবৎ ধহফ ধপঃ ষরশব ধ ষবধফবৎ। এটা যদি করতে পারি তাহলে আমরা সমন্বয় করতে পারবো এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারবো।

গোলাম মোর্তজা, নির্বাহী সম্পাদক, সাপ্তাহিক ২০০০

এই অঞ্চলের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিটি এরকম বিপদজনক আকার ধারণ করে থাকে কেন? আমরা চুক্তির পরের অবস্থা যদি খেয়াল করি- বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সময়, তারা চুক্তি করলেন, চুক্তির পরে চুক্তি বাস্তবায়ন করলেন না; বাস্তবায়ন না করে কালক্ষেপণ করতে শুরু করলেন নানাভাবে। এরমধ্যে আমরা দেখলাম ইউপিডিএফ নামে একটা সংগঠনের আত্মপ্রকাশ হলো। এই সংগঠনটি কারা? আমরা আজ পর্যন্ত আমাদের কোন রাজনীতিবিদরা এটার কারণ খুঁজে দেখার চেষ্টা করলাম না যে, ইউপিডিএফ কারা? এরা কিভাবে তৈরি হলো, এরা কিভাবে কাজ করছে?

বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের এমপি ছিলেন যারা তাদের সঙ্গে ইউপিডিএফের কি সম্পর্ক ছিল? ঐ অঞ্চলের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে ইউপিডিএফের কি সম্পর্ক ছিল? ইউপিডিএফের ঘাঁটিগুলো কোন অঞ্চলে, কোন অঞ্চল দিয়ে তারা যাতায়াত করে? ক্যান্টনমেন্টের আশেপাশে কেন ইউপিডিএফের ঘাঁটি? এই জিনিসগুলো আজ পর্যন্ত আমরা জানার কোন চেষ্টা করলাম না। সাধারণ মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম না।

এখন ঐ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির অন্যতম কারণ চুক্তির পক্ষ এবং বিপক্ষ গ্রুপের মধ্যে যুদ্ধ বা সংঘর্ষ, অপহরণ। চুক্তির পক্ষের কথা বলতে গেলে জনসংহতি সমিতি বা

সন্তু লারমাদের কথা চলে আসে আর চুক্তির বিপক্ষ বলতে ঐ ইউপিডিএফকে বোঝায়। চুক্তির বিপক্ষ যে ইউপিডিএফ তা এখন আছে। সেই ইউপিডিএফ এখন কিভাবে চলছে? বিএনপির সাংসদ আলোচিত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ওয়াদুদ ভূঁইয়ার সঙ্গে ইউপিডিএফের সম্পর্ক কি? কখন কোথায় মিটিং হয় এটা কি আমাদের এজেন্সীগুলো জানে কিনা, সরকার জানে কিনা। আমাদের মাননীয় উপমন্ত্রী সাহেব জানেন কিনা যে, ইউপিডিএফকে কোন জায়গা থেকে কে কিভাবে চালাচ্ছে?

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পরিকল্পিতভাবে কিভাবে অরাজকতাপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করে রাখা হচ্ছে, এর পিছনে বর্তমান সরকারের কোন কোন মন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যাক্তিবর্গের এবং ঐ অঞ্চলে কর্মরত আমাদের যে সামরিক বাহিনী, সেই সামরিক বাহিনীর ভূমিকা কী? আমরা অনেক ভালো ভালো কথা বলতে পারবো, সম্মিলিত উদ্যোগের কথা বলতে পারবো, কাজের কথা বলতে পারবো। কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত, যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক না কেন, সামরিক বাহিনীর ঐ অঞ্চলে উপস্থিতি এবং তাদের উদ্দেশ্য কি এবং তারা কি করতে চায়, তাদের পরিকল্পনা কি ইত্যাদি আমাদের রাজনৈতিক সরকারগুলো উপলব্ধি করতে পারবে এবং সেখানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে ততদিন পর্যন্ত আমরা এরকম সেমিনারের পর সেমিনার করে যাব। সন্তু লারমা অনেক কর্মব্যস্ততার মাঝে ও অসুস্থ শরীর নিয়েও ঢাকা শহরে আসবেন, সেমিনার করবেন, বক্তব্য রাখবেন। আমাদের সংসদ সদস্যরা আসবেন, রাজনীতিবিদরা আসবেন। ঠিক সমস্যা সমাধান করতে পারবো বলে আমি মনে করি না। পার্বত্য চট্টগ্রামকে আমি যেভাবে দেখেছি এবং আমার খুব ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেভাবে বুঝেছি তাতে মনে হয় না যে, এটার আসলে কোন সমাধান হবে।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে মাননীয় উপমন্ত্রী (মণিস্বপন দেওয়ান) তা সুন্দর করে বলেছেন যে, সেখানে ভূমি বিষয়টা কি ছিল এবং কিভাবে পাহাড়িরা নিজেদের ভূমি সংরক্ষণ করতো। তাদের ভুমির কোন কাগজপত্র নাই। বংশপরম্পরায় তারা মনে করে বা বিশ্বাস করে যে, এটাই তাদের নিয়ম বা এটাই তাদের ভূমি। আমাদের সরকারগুলো যাদেরকে সমতল ভূমি থেকে পার্বত্য অঞ্চলে নিয়ে বসতি স্থাপন করে দিয়েছে তারা এখন কোথায় আছে? তারা পাহাড়িদের যে জায়গা জমিগুলো ছিল সেই জায়গা জমিগুলোতে আছে। যারা সেটেলার বাঙ্গালী হিসেবে পরিচিত। কিন্তু আমরা ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় বলি আর বিরোধী দলে থাকা অবস্থায় বলি সেই সেটেলার বাঙ্গালীদের বিষয়ের প্রতি যদি সুস্পষ্টভাবে কোন বক্তব্য রাখতে পারি না। এটা ঠিক বাংলাদেশের বাস্তবতায় সেটেলার বাঙ্গালীদের এখন ফিরিয়ে আনার কথা বা ফিরিয়ে আনলে কোথায় পুর্নবাসন করা হবে- এ বিষয়গুলো খুব জটিল।

এই জটিল পরিস্থিতিতে মাননীয় উপমন্ত্রী সাহেবই হোক আর যেই হোক, রাজনৈতিকভাবে কেউ এই বিষয় নিয়ে সুস্পষ্ট করে কথা বলতে যাওয়াটা খুবই বিপদজনক এটা আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু তারপরও আমরা যদি পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যার সমাধান চাই, তাহলে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ যারা ভূমির অধিকার হারিয়েছে, যাদেরকে ভূমি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে তাদের ভূমি ফিরিয়ে দিতে হবে। তাদের ভূমি যদি আমরা ফিরিয়ে দিতে না পারি তাহলে শান্তি কোথা থেকে আসবে? শুধু কথা বলার তো কোন অর্থ হয় না। যদি ভূমির অধিকারটা ফিরিয়ে দিতে হয়, সেটেলার বাঙ্গালীদেরকে নিয়ে আমরা যেখানে বসিয়েছি তাদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে সেই ভূমিটাই পাহাড়ীদেরকে ফিরিয়ে দিতে হবে। পাহাড়ে হাজার হাজার একর জমি তো আর পড়ে নেই যে, সেই জায়গাগুলো তাদেরকে দিয়ে অন্য জায়গাগুলোতে সেটেলার বাঙ্গালীদের দেয়া যাবে। পাহাড়ীদের জমি পাহাড়ীদের ফিরিয়ে দিয়ে যে কোন উপায়ে ঐ অঞ্চল থেকে সেটেলার বাঙ্গালীদের নিয়ে আসতেই হবে, যদি আমরা সমস্যার সমাধান চাই। আর সেটা কিভাবে করা যাবে সেটা আমরা জানি না, সেই সমাধানটা খুঁজে বের করতে হবে।

গত কিছুদিন আগে বান্দরবান অঞ্চলে বিশেষ করে নাইক্ষ্যংছড়ি অঞ্চল থেকে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার হচ্ছে। এই অস্ত্রগুলো কাদের? কোথা থেকে আসছে এই অস্ত্রগুলো? এটা আমরা স্পষ্ট করে বলতে পারছি না। বলতে পারছি না কেন? বলে, দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে। দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে দেখে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর শুধু গোপন করেই যাবো কথাগুলো? মিয়ানমারের বিদ্রোহীরা বান্দরবান অঞ্চলে স্থায়ীভাবে ঘাঁটি করে আছে দীর্ঘদিন ধরে, এটা আমরা সবাই জানি। আমরা সাংবাদিকরা জানি, বুদ্ধিজীবীরা জানি, রাজনীতিবিদরা জানি। অথচ কেউ আমরা কোন কথা বলিনা! সামরিক বাহিনীও জানে।

আমি শেষ করবো অল্প একটু কথা বলে। গত বছর ঈদের একদিন আগে বা ঈদের দিন ছোট্ট একটি ঘটনা ঘটলো অপহরণের। গাইড কোর্স নামে একটি প্রতিষ্ঠান বান্দরবানে একটি রিসোর্ট করেছে। সেখান থেকে একজনকে অপহরণ করে নেয়া হলো। অপহরণ করে নেওয়া হলে ব্যক্তিগতভাবে আমি এ প্রতিষ্ঠানটির কাছাকাছি গিয়ে আমি এ বিষয়টির সঙ্গে কিছুটা যুক্ত হলাম।

স্বাভাবিকভাবে ধারণা করা হলো- চুক্তির পক্ষ বা বিপক্ষের কোন লোক হয়তো এটা করেছে। খোঁজ করতে গিয়ে আমার সবার সাথে কথা বললাম। কথা বলতে গিয়ে দেখলাম যে, এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে বা অপহরণটি করেছে মিয়ানমারের একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন। সেই বিচ্ছন্নতাবাদী সংগঠনটি বাংলাদেশের ভিতরে কোন জায়গাটিতে থাকে এই খবরটি বাংলাদেশের প্রায় সবাই জানে। এই অঞ্চল নিয়ে যারা কাজ করে তারা সবাই জানে। তারা সেখানে থেকে যাদেরকে অপহরণ করা হয়েছে গাইড কোর্সের কয়েকজন নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপন করলেন এবং প্রতিনিয়ত কথা হয়।

আজকে ৫০ লাখ, কালকে ৬০ লাখ, পরশু দিন ৪০ লাখ এরকম টাকার দেন-দরবার করা হয়। এক পর্যায়ে গিয়ে এর সঙ্গে আমাদের সামরিক বাহিনী জড়িত হয়ে গেল। মজার বিষয়, এখানে আমাদের কোন কথা বলতে নেই, কোনকিছু বুঝতে পারি না। তারপরও বলে দিই যে, সামরিক বাহিনী এক পর্যায়ে গিয়ে দেখলাম তারা এই দেন দরবারে একটি অংশ হয়ে গেল। তারা দরবার করে দিচ্ছে, তারা আলোচনা করে দিচ্ছে। সমস্যা সমাধান করতে চাইছে কী, ঠিক আছে ওরা ৪০ লাখ চাইছে, আপনারা ৩০ লাখ টাকা দিতে রাজি হন। আমরা সমস্যার সমাধান করে দিই।

আমরা জানি যে, সামরিক বাহিনী নাকি যে কোন জায়গাতে, যদি কোন জায়গা থেকে কোন একটি গুপ্ত সংগঠন ওয়ারলেসে কথা বলে তাহলে সামরিক বাহিনী খুব সহজে দ্রুততার সঙ্গে ঐ জায়গায়টা ডিটেক্ট করতে পারে যে, এই জায়গাতে তারা আছে এবং খুব সহজে বিষয়টা ধরতে পারে। আমি আমাদের সামরিক বাহিনীর দুই একজনকে বললাম বিষয়টির কথা। কিন্তু তারা কেউই বিষয়টি কর্ণপাত করলেন না। দুই একজন আমাকে বললেন, ও আচ্ছা, তাই নাকি, এভাবে করা যায় নাকি? এই বলে বিষয়টি এড়িয়ে গেলেন এবং শেষ পর্যন্ত সেই অপহরণ ঘটনাটির সমস্যা সমাধান হলো সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে।

যদিও এটার কোন তথ্য প্রমাণ নেই, বললেও আমি কোন প্রমাণ দিতে পারবো না। কিন্তু সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে বেশ বড় অংকের টাকা দিয়ে মুক্তিপণের মাধ্যমে তাকে ছাড়িয়ে আনা হলো বান্দরবান থেকে, বান্দরবান এবং বাংলাদেশের ভিতরের একটি অঞ্চল থেকে। সেটা মায়ানমার-বাংলাদেশের সীমান্ত নয়, সীমান্ত থেকে কমপক্ষে ৩০ কিলোমিটার ভিতরে বান্দরবানের ভিতরের একটি জায়গায়। মোটা অংকের অর্থ দেয়া হলো এবং অর্থের বিনিময়ে তিনি চলে আসলেন এবং এখনও পর্যন্ত তারা ঐ অঞ্চলে অবস্থান করছেন।

এই যে আজকে অস্ত্র উদ্ধার হচ্ছে, আকার ইঙ্গিতে বুঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিবাদমান গ্রুপগুলো আছে, এগুলো তাদের অস্ত্র। আসলে এই অস্ত্রগুলো তাদের নয়, এ অস্ত্রগুলো

মায়ানমারের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের। এই অস্ত্রগুলো কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাবে, এই অস্ত্রের ভাগীদার কারা, এই অস্ত্রের বাংলাদেশের ভেতরের কারা কারা শেয়ার পায়, এই লেনদেনের অংশ পায়, এই জিনিসগুলো আমরা যারা ক্ষমতায় আছি, আমরা যারা রাজনীতি করি, আপনারা যারা রাজনীতি করেন তাদের এই বিষয়গুলো অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। যতদিন পর্যন্ত না উপলব্ধি করতে পারবো আমরা, ততদিন পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান আমরা কোনভাবে করতে পারব না। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমস্যা সমাধান না করতে পারলে আর যাই হোক সমগ্র বাংলাদেশে আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারব না।

এই মূহর্তে বাংলাদেশের জন্মের ৩৩ বছর পরে এসে আমার খুব সাধারণ বুদ্ধিতে আমি বুঝি যে, রাজনীতিবিদদের ঐক্য প্রয়োজন এবং ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন যে, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অঞ্চল। এই অঞ্চলটিকে আমরা অবশ্যই আমাদের সীমানার মধ্যে রাখতে চাই। রাখতে চাওয়ার জন্য এই অঞ্চলটিতে আমরাই বসবাস করবো, আমরাই নিয়ন্ত্রণ করবো, কোন বিচ্ছন্নতাবাদী সংগঠনকে নিয়ন্ত্রনের সুযোগ দিব না। যদি এই কাজটা আমরা করতে পারি আমার ধারণা তাহলেই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমরা বক্তব্য শেষ করছি।

রোকেয়া কবীর, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ

অনুষ্ঠানের মাননীয় সভাপতি, সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা, মঞ্চে উপবিষ্ট নেতৃবৃন্দ, এখানে আগত জুম্ম জনগোষ্ঠীর বন্ধুগণ, উপস্থিত সুধীবৃন্দ। আসলে আমি আজকে শুনতে এসছিলাম আর আমি আসলে চলেও যেতে চাচ্ছিলাম। কারণ আমার একটা মিটিং আছে, ওখানে কিছু প্রস্তুতিও আছে।

আমার আগের বক্তা মোর্তজা যে কথাগুলো বললো এবং এর আগে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে কথাগুলো বলে গেলেন, সমস্যাটা আসলে জটিল সমস্যা কিনা সেটা অবশ্যই আমরা বাইরে থেকে দেখলে জটিলই মনে হয়। সমস্ত সমস্যার মতই পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের সমস্যাও একই রকমের জটিল বা খুব বেশী জটিল না। মূল জটিলতা হয় এবং এখানের সবার কথার মধ্যে বের হয়ে আসছে, মোর্তজার কথা থেকেও বেরিয়ে আসছে যে, একটি কায়েমী স্বার্থাবাদী গ্রুপের স্বার্থ দেখতে গিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়।

আমরা জনগণের স্বার্থ দেখবো এবং জনগণের জীবন জীবিকার উপায় খুঁজে বের করার জন্য পথ দেখাবো এবং আইন-কানুন, শান্তিচুক্তি সেটা যাই হোক সেভাবে দেখবো, তাহলে এই শান্তিচুক্তির বাস্ত বায়ন খুব একটা অসুবিধার না। অনেক সময় এখানে বলা হয় যে, পাহাড়ী-বাঙ্গালী, বাঙ্গালী সেটেলারদের মধ্যে একটা সংঘাত। আসলে এই দরিদ্র সেটেলারদের গুটি হিসেবে ব্যবহার করছে কায়েমী স্বার্থবাদী গ্রুপগুলো তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য। এটা বুঝতে খুব বেশী পড়াশুনা করতে হয় বা খুব বেশী যে জানতে হয় তাও না।

১৯৯৪/৯৫ সালের দিকে আমি আমার বাড়ী ছেড়ে নিরাপত্তার জন্য আমার মেয়েকে নিয়ে একা থাকতাম। নিরাপত্তার স্বার্থে একটা ফ্লাট কিনার জন্য একটা কমপ্লেক্সে গেলাম। আমাদের পরিচিত এক বন্ধু ছিল। কয়েকটা মাত্র ফ্লাট সেখানে খালি ছিল, তা আমাকে দেখাচ্ছিলেন। তার মধ্যে একটা ফ্লাট তৈরী হচ্ছে এবং সেখানে দেখলাম অনেক সেগুন গাছ একটা বড় রুমে। ইঞ্জিনিয়ার আমাকে দেখাচ্ছিল তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই ফ্লাটটি কি কোন আর্মি অফিসারের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে কিনা। আমি কোনদিনও এর আগে ঐ কমপ্লেক্সে যায়নি। উনি বললেন, হ্যাঁ, আপনি জানলেন কেমন করে? আমি বললাম, এই সেগুন গাছ দিয়ে। এত সেগুন গাছ ব্যবসায়ীরাও এভাবে ব্যবহার করবে না। কারণ ব্যবসায়ীরা যতটুকু দরকার ততটুকু ব্যবহার রাখবে। এতটুকু এখানে রাখবে না। এটা হলো একটা ছোট দিক। আমাদের দেশের সেনা অফিসারদের জন্য যে এলাকাটা রাখা হয়েছে সে

এলাকার প্রত্যেকটি বাড়ী গিয়ে দেখবেন সেগুন গাছ। গুলশানের অনেক বাড়ীতেও এ ধরনের সেগুন গাছ নাই। সুতরাং এখান থেকে সেনাবাহিনী কেন উইড্র হবে! যে কোনভাবে যে কোন কায়দাকানুন করে, দরকার হলে বাঙ্গালীদেরকে আরও দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহার করে তাদের জানের বিনিময়ে হলেও তারা ওখানে থাকার চেষ্টা করে। এখন এই জিনিসটা যদি আমরা বুঝতে পারি, সবাই যদি আমরা এটা বুঝি, তাহলে সেভাবে আমরা ব্যবস্থা করবো।

আমি আর কথা বাড়াবো না। কারণ এখানে যারা উপস্থিত আছি তারা সবাই মোটামুটিভাবে জানি বিষয়টা কি। সুতরাং আমার বলার কিছুই থাকে না। শুধু একটা কথা বলবো, নারী আন্দোলনের কর্মী হিসেবে আমি দেখেছি, ঐ এলাকায় কাজ করতে গিয়ে আমি দেখেছি যে, নারীরা সবচেয়ে বেশী ওখানে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এটা সব জায়গাতে হয়। এটা সব জায়গাতে, সংঘাত যেখানে থাকবে, সেটা আফগানিস্তানে হোক, বর্তমানে ইরাকে হোক বা অন্য যে কোন জায়গায় হোক সেখানে নারীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। কারণ সিষ্টেমের কারণে নারীরা একটি অসুবিধাজনক অবস্থানে থাকেন। তারপরে সংঘাত সৃষ্টি হলে এই বোঝাটা আরো বেড়ে যায়।

সেখানে নারীদের অবস্থান থেকেও আমি বলতে চাই যে, শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন ছাড়া ঐ এলাকায় নারীদের অবস্থার পরিবর্তনটা খুব কঠিন হবে। তারপরেও কিন্তু আমি জুম্ম জনগোষ্ঠী বা আদিবাসী জনগোষ্ঠী, তাদের নেতৃবৃন্দকে বলবো- আপনারা যখন আলাপ আলোচনা করেন, চুক্তি করেন, সবসময় এই নারীদের বিষয়টা এবং সম্পত্তিতে তাদের অধিকার থেকে শুরু করে শ্রমের ন্যায্যমূল্য ইত্যাদি বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখবেন। আমি অবাকই হয়েছিলাম যখন দেখলাম যে, ওখানে আদিবাসী নারীরা অনেক বেশি কাজ করে। কিন্তু তারা শ্রমের মূল্য পায় পুরুষদের তুলনায় অনেক কম। এই একটা উদাহরণ আমি দিলাম, আরো তো আছেই। এই বিষয়গুলো আপনারা একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন। সবাইকে ধন্যবাদ।

হাসানুল হক ইনু, সভাপতি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল

শ্রদ্ধেয় সন্তুদা, শ্রদ্ধেয় জাতীয় নেতৃবৃন্দ, উপস্থিত সুধীমন্ডলী, আমার ভাই ও বোনেরা। ক'দিন আগে আমাকে জনসংহতি সমিতি এবং শ্রদ্ধেয় সন্তু লারমা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বান্দরবানে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মৃত্যু দিবস উপলক্ষে বক্তব্য রাখার জন্য। আমি গিয়েছিলাম বান্দরবানে। বান্দরবানের সবার সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। সবার চোখে মুখে দেখেছি উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, আশংকা এবং প্রতিবাদ। এটা ভালো লক্ষণ নয়।

চুক্তির সাত বছরের মাথায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল অধিবাসীর পক্ষে জনসংহতি সমিতি এবং বিশেষ করে সন্তু লারমা প্রকাশ্যে তাঁর বক্তব্য, বিবৃতি, সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে 'চুক্তি বাস্তবায়ন হচ্ছে না' এই অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। বাংলাদেশের আদিবাসী যারা আছেন তাদের ৮ দফা দাবী আর পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী যারা তাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবী- এই দুটোই এখন রাজনৈতিক টেবিলে আছে এবং এটা নিয়ে প্রচুর আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। আমি খুব সংক্ষেপে কয়েকটা কথা বলে নিচ্ছি।

বাংলাদেশে আমি জাতিতে বাঙ্গালী, আর পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা ভিন্ন জাতি, কিন্তু দুজনেই এক জায়গায় মিল আছে, সেটা হচ্ছে আমরা দুজনেই বাংলাদেশের নাগরিক। আর বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে দেশের মালিক আমরা উভয় পক্ষই আছি। এই মালিকদের যদি রাষ্ট্র বা সরকার ভাগ করার নীতি গ্রহণ করে ধর্ম, বর্ণ বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বা জাতিসত্ত্বার ভিত্তিতে, তাহলে সেই দেশের ভিতরে অশান্তি তৈরী হয় এবং এটা একটা বড় ধরনের রাজনৈতিক অপরাধ এবং এটা সংবিধান লংঘনের অপরাধের সঙ্গে সামিল। সুতরাং এটা বাংলাদেশের ৩৩ বছরের ধারাবাহিকভাবে যারা শাসন

করেছেন বা ক্ষমতায় ছিলেন, তারা সংবিধানের নির্দেশ অমান্য করে দেশ শাসন করতে গিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করেছে।

আর দুটো খুঁট ছিল। একটা খুঁট হচ্ছে যে, ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার স্বীকৃতি সেখানে ছিল না। আরো একটা হচ্ছে, সংবিধানে জমির মালিকানা সর্ম্পকে। তিন ধরনের মালিকানার কথা বলা হয়েছে এখানে। সেখানে সমবায় মালিকানা, ব্যক্তি মালিকানা এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানা। কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পার্বত্য চট্টগ্রামে সম্প্রদায়গত মালিকানা ছিল এবং এই সামাজিক মালিকানার ব্যাপারে আমার সংবিধান কোন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ধারণা দেয়নি। সুতরাং এই দুটো খুঁট- ক্ষুদ্র জাতিসত্তার স্বীকৃতির অনুপস্থিতি এবং ভুমি মালিকানায় সম্প্রদায়ের অধিকার অনুল্লেখ থাকার ফলে এখান থেকেই রাজনৈতিক ভুলের সূত্রপাত।

এখানে যখন বঙ্গবন্ধু এই দুটো ভুলের উপর দাঁড়িয়ে দেশ শাসনের দায়িত্ব নিলেন সেদিন থেকে এই ভুলের সুত্রপাত। সেখানে আমাদের প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বলেছিলেন- রাজনৈতিক অধিকার ছাড়া কোন অধিকার টিকে না। উনি সংসদ সদস্য থাকার ফলে এই উপলব্ধি থেকে উনি চারদফা প্রস্ত াব তৎকালীন সরকারের কাছে উথাপন করেন। দুর্ভাগ্য, সেই চারদফা সরকার গ্রহণ করেনি। আমরা মনে করি ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ যদি একটা মহান রাজনৈতিক অর্জন হয়ে থাকে তাহলে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার সঙ্গে সর্ম্পক উথাপনের প্রশ্নে লারমার চারদফার প্রস্তাব অস্বীকার করা একটা মহা রাজনৈতিক ভুল হয়েছে। এই রাজনৈতিক ভুল জিয়া সংশোধন করেনি, এরশাদ সংশোধন করেনি।

তবে সৌভাগ্যের বিষয়, বিগত শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামীলীগ সরকার এই ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ভুলটা সংশোধন করে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন। তারপর থেকে আমরা আশা করেছিলাম আমরা যারা বাঙ্গালী জনগণ, যারা শাসকগোষ্ঠীর এই ভুলের সঙ্গে একমত ছিলাম না, যারা আপনাদের সংগ্রামের পক্ষাবলম্বন করেছিলাম, আপনাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলাম, আমরা আশায় বুক বেঁধেছিলাম যে, এবার পাবর্ত্য চট্টগ্রামে এবং বাংলাদেশের শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। যাই হোক সেটা হয়নি, আপনারা সেটা বলছেন।

আমি কথা না বাড়িয়ে, প্রথমে আমি এখানে আপনাদের পক্ষ থেকে যে প্রতিবেদন হাজির করা হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে যে, চুক্তির বহু ধারা অবাস্তবায়িত আছে। পার্বত্য সমস্যা একটি রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যা। এই দুটো কথার সঙ্গে আমার দল এবং আমি এবং আমি যে ১৪ দলে সঙ্গে সংগ্রাম করছি আমরা একমত পোষণ করছি। চুক্তি বানচালের জন্য বর্তমান জোট সরকার এবং আগের সরকারও কিছুটা দায়ী আছে। আপনারা বলেছেন, চুক্তি পূর্বকালীন সময়ের মত সেনাবাহিনী আচরণ করছেন। আপনারা বলছেন, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে সেটেলারদের উসকে দেওয়া হচ্ছে। আপনারা বলেছেন যে, ভুমি বেদখল হচ্ছে এখনও এবং ভাগ করা নীতির ভিত্তিতে ঐ অঞ্চল শাসন করার একটা চক্রান্ত চলছে। সরকার সৃষ্ট সন্ত্রাসীরা তৎপর আছে এবং তাদেরকে মদদ দেওয়া হচ্ছে। চুক্তির পক্ষদেরকে গ্রেফতার এবং হয়রানি করা হচ্ছে। রাষ্ট্র সমর্থনপুষ্ঠ সমঅধিকার আন্দোলন, বাঙ্গালী গণ পরিষদ, নাগরিক ফোরাম, বাঙ্গালী সমন্বয় পরিষদ, বাঙ্গালী ছাত্র পরিষদ- এরা সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে এবং চুক্তি বানচালের লক্ষে ধারাবাহিক কার্যক্রম করছে। সেখানে রাষ্ট্র এবং সরকার পৃষ্ঠপোষকতা করছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে আপনারা বলছেন যে, কতিপয় পদক্ষেপ অবিলম্বে গ্রহণ করা দরকার। সেখানে আপনারা বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বাঙ্গালী চেয়ারম্যান ওয়াদুদ ভুইয়াকে অবিলম্বে অপসারণ করা এবং চুক্তির ভিত্তিতে উপজাতীয়দের ভিতর থেকে একজনকে চেয়ারম্যান নিয়োগদান করা। আপনারা বলেছেন, অপারেশন উত্তরণ অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া এবং

অস্থায়ী ক্যাম্পগুলো প্রত্যাহার করে নেওয়া। আপনারা বলেছেন, সেটেলারদের পুনর্বাসন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা। আপনারা বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে উপজাতীয় থেকে একটি পূর্ণ মন্ত্রী নিয়োগ দান করা, স্থায়ী বাসিন্দা নিয়ে ভোটার তালিকা তৈরী করা এবং অবিলম্বে মনোনীত চেয়ারম্যানের বদলে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত পরিষদ গঠন করা। আপনার বলেছেন, ভুমি কমিশন কার্যকর করা এবং একমাত্র সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান করা।

এই দাবিগুলো, এখানে বহু দাবি আপনাদের আছে, যেগুলো আপনারা চুম্বক আকারে বলেছেন। আমি এবং আমার দল, আমরা মনে করি, চুক্তি বানচালের যে জোটের চক্রান্ত বা সরকারের চক্রান্ত, যে বিষয়গুলো আপনারা উল্লেখ করেছেন, এগুলো আমার তথ্য আমার দলের খবর এবং আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা মনে করি আপনারা সত্যি কথা বলেছেন, মিথ্যা বলেননি এবং এখানে কোন ভুল তথ্য নাই। সেদিক থেকে আপনাদের সাহসের সঙ্গে চুক্তি বানচালের চক্রান্তের বিষয়টি উল্লেখ করার জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাচ্ছি- অবিলম্বে এটা বন্ধ করার চেষ্টা করা উচিত। এখন এ রকম একটা পরিস্থিতিতে আপনারা যারা এখানে আছেন, প্রথমে আমি মনে করি বিশ্বাস স্থাপন এবং আস্থা অর্জন করাটা হচ্ছে সব চাইতে বড় কর্তব্য।

দেশের মালিক যারা সেই নাগরিকদের অবিশ্বাস করার নীতি, এটা যারা জোটে আছেন, সরকারে আছেন, রাষ্ট্রে আছেন, তাদের পরিহার করতে হবে। চুক্তি বানচালের সকল তৎপরতা এখনি বন্ধ করতে হবে। চুক্তি বস্তবায়নের জন্য ধারাবাহিক আলোচনার সূত্রপাত করতে হবে। চুক্তি বাস্তবায়নে দেরী করার নীতি এখনই পরিহার করতে হবে। আর জোটের উগ্রবাদ যা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি করছে, অবিলম্বে এই উগ্রবাদের নীতি বন্ধ করতে হবে। এখনি যেটা করতে পারেন, সেটেলারদের উস্কানি বন্ধ করে দেওয়া, অত্যাচার-নির্যাতন বন্ধ করে দেওয়া, অস্থায়ী সেনাক্যাম্পগুলো প্রত্যাহার করা এবং পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর- এই প্রক্রিয়াটা এই মুহূর্তে ত্বরান্বিত করা। এই পদক্ষেপগুলো আমি মনে করি এখনি নেওয়া উচিত।

তবে যে সরকার ক্ষমতায় আছেন তারা যেহেতু চুক্তি বানচালের সাথে সরাসরি জড়িত এবং তারা ক্ষমতায় আসার আগে প্রকাশ্যে চুক্তির বিরোধিতা করেছিল, সুতরাং এই জোটকে ক্ষমতায় রেখে এই চুক্তি বাস্তবায়নের কোন গ্যারান্টি আমি রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে পাচ্ছি না, দেখি না। পাহাড়ী জনগোষ্ঠী, আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে আমি আমন্ত্রণ জানাবো, জাতীয় পর্যায়ের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সুত্রপাত হয়েছে, সেই আন্দোলনের সঙ্গে ঐক্যের সেতুবন্ধন রচনা করে জোটকে যথ দ্রত বিদায় করা যায়- সেটার রাজনৈতিক কর্মপন্থা গ্রহণ করা। একই সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখবেন, সম্প্রদায়িকতার চির বিদায় যদি না করতে পারেন তাহলে কোনদিনই ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার প্রকৃত রাজনৈতিক অধিকার বাংলাদেশে সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে না। সুতরাং এবার দ্বিমুখী কর্তব্য- জোটের বিদায় এবং সাম্প্রদায়িকতার ধ্বংস এবং চির বিদায়- এই দুটো কর্তব্যের পাশাপাশি এই রাজনৈতিক পদক্ষেপও নিতে হবে যে, আরো একবার বাংলাদেশের চার মূলনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতি পরিচালনার একটি সরকার গঠন করা; যে সরকার রাজনৈতিক গ্যারান্টি প্রদান করবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য এবং আদিবাসীদের আট দফা দাবি বাস্তবায়ন করার জন্য।

আমি সেখানে মনে করি, আমার দল সেখানে মনে করে যে, এটা তেত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা বলছে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, দুই-তৃতীয়াংশের ভোটের দল, যারা চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সেই দলও চুক্তি বাস্তবায়নে গড়িমসি করেছে। এ রকম একটি পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সকল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তিকে আজকে রাজনৈতিকভাবে অঙ্গীকার প্রদান করতে হবে যে, তারা এই চুক্তির পক্ষে দাঁড়াবেন এবং বাস্তবায়নের পক্ষে দাঁড়াবেন। সুতরাং চার মূলনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র এবং সমাজ পরিচালনার অঙ্গীকারই যথেষ্ট নয়, সেটা কেবলমাত্র তখনই

গ্যারান্টিপ্রাপ্ত হবে, যদি এক ব্যক্তি একজনের বদলে সম্মিলিত একটি জাতীয় সরকার কিছু দিনের জন্যে বাংলাদেশে কায়েম করা সম্ভব হয়।

আমি আপনাদেরকে যারা এখানে উপস্থিত আছেন আমি এই প্রস্তাবগুলো আপনাদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছি এবং আবারও বলছি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নের একটি বিশাল জায়গা, যেখানে আমরা এগুতে পারি এবং সংবিধানের খুঁট সংশোধন এবং চার মূলনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার একটি স্বপ্ন বাস্তবায়নের একটি ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা নেয়া যায় কিনা।

আনন্দের খবর, আমরা চৌদ্দটি দল যে নয়টি দাবী জাতির সামনে উত্থাপন করেছি, আপনারা দেখবেন, আওয়ামীলীগ, ওয়ার্কার্স পার্টি, কমিউনিষ্ট পার্টি, সাম্যবাদী দলসহ আমরা চৌদ্দটি দল সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ও আদিবাসীদের অধিকার ও মর্যাদা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার ও মর্যাদা বাস্তবায়নের একটি রাজনৈতিক অঙ্গীকার করেছি। আমি সকল শরীক ১৪ দলের নেতা-নেত্রীদের আহ্বান জানাবো- আমরা এই অঙ্গীকারের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে আসুন জোট সরকার অপসারণের আন্দোলনে শরীক হই এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসাধারণকে বলবো, বিজয় যখন আপনাদের একবার হয়েছে চুক্তি স্বাক্ষর করে, ইনশাল্লাহ্ সে বিজয় ধরে রাখার মতো রাজনৈতিক শক্তি এবং নেতৃত্ব বাংলাদেশে আছে। সবাইকে ধন্যবাদ।

এ্যাডভোকেট নিজামুল হক নাসিম, বিশিষ্ট আইনজীবী

আজকের সভার আমার শ্রদ্ধেয় সভাপতি, শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ এবং উপস্থিত বাঙ্গালী পাহাড়ী ভাই ও বোনেরা। আমি আজকে আপনাদের এখানে কিছু বলার সুযোগ পেয়ে নিজেকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত মনে করছি। জীবনের পথ চলার পথে পথে মাঝে মাঝে বিভিন্ন কাজ করতে হয়, কাজ করা হয়। ৯০-এর আন্দোলনের পরে যেভাবে দেশে গণতান্ত্রিক কারবার শুরু হয় তখনি আমার সুযোগ ঘটে বিশেষ করে পাহাড়ীদের পক্ষে কিছু মামলায় তাদের প্রতিনিধিত্ব করা এবং তাদেরকে জেল থেকে বের করার চেষ্টা করা; যখন তাদের পক্ষে সারা দেশে, বিশেষ করে ঢাকা শহরে কেউ তাদের পক্ষে দাঁড়াতেন না, দাঁড়াতে পারতেন না বলবো না, দাঁড়াতেন না।

সেই সময় আমার সুযোগ হয়েছিল, সেই সুযোগটা এখনো আমার আছে সে মামলাগুলো পরিচালনা করবার। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের অভিজ্ঞতা যদি আবার তুলনা করে, চিন্তা করে দেখি তাহলে একটু আশ্চর্য হয়ে যাই, কিভাবে তাদেরকে বঞ্চনা করা হয়েছে! যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই, বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতারে ডিটেনশনে থাকা অবস্থায় আমাদের সংবিধানে আছে যে, প্রতি ৬ মাসের ভিতরে তাকে রিভিউ বোর্ডে হাজির করতে হবে। এই ধারাটা বাংলাদেশের যে কোন কর্মকর্তার জানা থাকার কথা এবং তারা জানেন। জানেন না- আমি এটা স্বীকার করবো না। কিন্তু আইনজীবী হিসেবে আমি যখন দেখলাম যে, এক একজন ডিটেনীকে আট/দশ বছর জেলে রাখা হয়েছে রিভিউ বোর্ডে পেশ না করে। তখন কোর্টকে একবার প্রশ্ন করেছিলাম, যে অফিসার এই ডিটেনশনগুলো এ্যাপ্রাভ করে ংঃধু করতেন প্রতি তিন মাস পর পর তাকে কোর্টে আনা হবে না কেন? মৌলিক আইনে ৬ মাসের ভেতরে রিভিউ বোর্ডে পেশ না করলে ডিটেনশনটা বেআইনী হয়ে যাবে এটা যে স্বরাষ্ট্র সচিব জানে না তার তো অন্তত পক্ষে এই পোস্টে থাকার উপযুক্ততা নাই। আমার জীবনে এ রকম ন্যূনতম ২০০/২৫০ মামলা পেয়েছি যারা বছরের পর বছর ডিটেনশনে থেকেছেন। একবারের জন্যও রিভিউ বোর্ডে পেশ করা হয় নাই। যে মুহূর্তে হাইকোর্টে রিট করা হয়েছে আমরা রিলিজ অর্ডার পেয়ে গেছি।

এ থেকে আমি বলতে চাচ্ছি যে, আসলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য আছে। যেমন আমরা সব সময় মনে করি যে, আমরা বাঙ্গালীরা সুপ্রিম আর তারা সব নীচুস্তরের লোক আর কি! এই ভাব মনে হয়

আমাদের মধ্যে আছে যেটা খুবই দুভার্গ্যজনক এবং হতাশাজনক। তবে সময়ের বিবর্তনে আজকে আমরা নিজেরা অনেক কাছাকাছি এসেছি এবং আজকে এখানে আমরা বসতে পারছি বা বসছি। এই যে অগ্রগতি, আমি বলবো ৯০-এর পরে যখন সুযোগ হয়েছিল একে অন্যের সাথে কথাবার্তা আদান প্রদান করার, একে অপরকে চিনবার, জানবার সুযোগ হয়েছিল এবং তৎকালীন সময়ের পরে আজ পর্যন্ত যে যোগাযোগটা পাহাড়ীদের সঙ্গে বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীদের, বাঙ্গালী মানবাধিকার কর্মীদের হয়েছে তারই ফলশ্রুতি এটা।

আজকে আমরা নজর দিতে পারছি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পরে। অবশ্য আমরা অন্য কোন আদিবাসীর দিকে নজর দিতে পারছি না। একবার যদি তাকিয়ে দেখি আমরা দেখবো বাঙ্গালীর নাম্বার কিন্তু বছর বছর বাড়ছে কিন্ত গারোদের নাম্বার বাড়ে না, সাঁওতালদের বাড়ে না, মনিপুরিদের বাড়ে না এবং আমার মনে হয় চাকমাদেরও এখন আর বাড়ে না। এর অর্থটা কি? অর্থ হলো তারা তাদের জায়গা জমি থেকে এখনও উৎখাত হচ্ছে। গারো হিলে গেলে, টাঙ্গাইল-মধুপুরে গেলে, ময়মনসিংহে গেলে দেখা যায় গারোদের নাম্বার কমে যাচ্ছে। ওদের জায়গাও কমে যাচ্ছে। সাঁওতালদের এলাকায় গেলে দেখা যায় ওখানেও তাদের নাম্বার কমছে, জায়গার পরিমাণও কমছে। সিলেট গেলে দেখা যায় মনিপুরিদের নাম্বারও কমছে, জায়গাও কমছে। খাসিয়াদের নাম্বার কমছে, জায়গাও কমছে।

আমাদের মন্ত্রী সাহেব বললেন যে, আমাদের আদিবাসীদের প্রথা আর বিশ্বাস যে এই জমি আমাদের এবং আমাদের নেতৃবৃন্দই এই জমি আমাদেরকে ভাগ করে দিচ্ছে এবং আমরা খাচ্ছি। যদিও সেগুলো সব রাষ্ট্রীয় তাবৎ জমি হিসেবে লিপিবদ্ধ আছে। এখন যারা এই রাষ্ট্রীয় জমিগুলো আমরা যারা এতদিন দীর্ঘদিন যাবৎ বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ ব্যবহার করেছে, যেহেতু তাদের ব্যক্তিগত মালিকানা নাই বা কোন কাগজপত্র ওদের পক্ষে নাই, যেটা সমষ্টিগত সম্পত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসছে, সেটা যখন আমাদের অফিসাররা লীজ দেন তখন তারা আর ওদের দিকে তাকান না এবং তারা দেখেন, তাদের বাঙ্গালী যারা আছে তাদেরকে লীজ দেওয়া উচিত। যেটা সম্পূর্ণ বেআইনী কাজ তারা করছেন। কারণ যিনি দখলে আছেন লীজ তিনি আগে পাবেন, দখল না থাকলে প্রথাগত লীজ হিসেবেও তিনি দখল আগে পাবেন। এগুলো সব অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। অগ্রাহ্য করে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বাঙ্গালীদেরকে সেসব জায়গা দেয়া হচ্ছে। আর পরবর্তীতে আমরা দেখি যে, পাহাড়ীরা উৎখাত হচ্ছে সেই জায়গা থেকে। সরকারী ক্ষমতা বলে উৎখাত করা হচ্ছে। বেআইনী ক্ষমতা বলে উৎখাত হচ্ছে।

আমি মনে করি যে, পাহাড়ীদের এখন তাদের জমি মালিকানা নিয়ে একটা আন্দোলন করা দরকার এবং এটাকে আরও জোরদার করা দরকার এবং পাহাড়ীদের জমির মালিকানার স্বীকৃতি যেটাকে আমরা সমষ্টিগত অধিকার বলি, গ্রুপ ভিত্তিক পাহাড়ীদের জায়গা, এখানে কোন অপাহাড়ীদের জায়গা থাকতে পারবে না, থাকলেও তাদেরকে লীজ দেয়া হবে না। এটা যদি প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে তাহলে আমার বিশ্বাস পাহাড়ীরা যেভাবে উৎখাত হচ্ছে সেটি অনেক কমে যেতে পারে। আর আইনজীবী হিসেবে যাই করি, একটা কথা আপনাদেরকে বলতে পারি, যে কোন লিগ্যাল প্রয়োজনে, এতদিন আপনাদের পক্ষে কাজ করেছি আজও বলতে পারি, যতদিন বেঁচে থাকবো আপনাদের পক্ষে যেন কাজ করতে পারি এই দোয়া আপনাদের কাছে চাচ্ছি। ধন্যবাদ।

দীলিপ বড়ুয়া, সভাপতি, বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল

আজকের এই মহতী আলোচনা সভার শ্রদ্ধেয় সভাপতি, উপস্থিত জাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং সুধীবৃন্দ। আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এ বিষয়ে যাওয়ার পূর্বে আমি একটা কোটেশন বলতে চাই, তা হচ্ছে- Peace is the continuation of war; war is the continuation of peace।

আজকে আলোচনা হচ্ছে সুর্দীঘ প্রায় পঁচিশ বছরের সশস্ত্র সংগ্রামের একটা যৌক্তিক পরিণতির ফলশ্রুতিতে। যদিও সেদিন ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর যে শান্তি চুক্তি হয়েছিল, তাতে আমরা যে প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলাম রাজনৈতিক দল হিসেবে, সেটা ছিল যে, চুক্তি হয়েছে এটা একটি ইতিবাচক। কিন্তু এটা যদি বাস্তবায়িত হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করতে হবে এবং বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে স্বার্থান্বেষী মহলগুলো প্রতি পদে পদে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

সাত বছর পর এখনও শান্তি চুক্তি কাগজে রয়ে গেল। সেদিন সমগ্র জাতি যে আশা উদ্দীপনা নিয়ে এই চুক্তি করেছিল এখনো তা বাস্তবায়িত হয়নি। তা বাস্তবায়িত না হওয়ায় মূল দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে দুটি- প্রথমতঃ হচ্ছে যারা বাংলাদেশে শাসনকর্তা এতদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন, যারা এই সংকট সৃষ্টি করেছিলেন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ৭৫-এর পরবর্তী পর্যায়ে এবং তাদের একটা ধারণা ছিল যে, এই বাংলাদেশ এখানে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর জন্য নয়। এই মনস্তাত্বিক বিষয়টি এখনও ক্রিয়াশীল। এখনো বলা হচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমগ্র দেশের আয়তনের ১০ ভাগের এক ভাগ। ওখানে যদি উপজাতি তথা জুম্ম অধিবাসীরা না থাকে তাহলে সমস্ত জায়গা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর হয়ে যায়। এই মানসিকতা, এই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়।

আরেকটি অন্তরায় হচ্ছে এখানে অনেকে বলে থাকেন, শাসকগোষ্ঠী, সামরিক বেসামরিক আমলা, রাজনীতিবিদ যারা বলে থাকেন, ঐ জনগোষ্ঠীর লোকেরা যদি ঢাকাতে চাকুরী-বাকুরী করতে পারে তাহলে বাঙ্গালীরা ঐখানে থাকতে পারবে না কেন? ওখানকার সম্পদ লুন্ঠন করা আমাদের নৈতিক অধিকার। একদিকে সরকার বলছে, ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি চলবে, আবার অন্যদিকে তারা এই ধরনের এই কর্মকান্ডের মধ্যে দিয়ে একটি সাম্প্রদায়িক বিষপাম্প প্রতিনিয়ত ছড়াচ্ছে। তার মধ্য দিয়ে তারা এতদাঞ্চলকে শাসন করতে চাচ্ছে। এই দ্বিবিধ কারণে এই সরকার বা ইতিপুর্বের সরকারসমূহ এই সমস্ত নীতি অনুসরণ করেছে বলে আজকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধান হচ্ছে না।

আমাদের দল বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রতিনিয়ত প্রতি মুহূর্তে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের; শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের নয়, সিলেট বা উত্তর অঞ্চলের আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের কথা বলে আসছে এবং তাদের স্ব-শাসনের কথাও বলে আসছে। সেই স্বশাসন এবং তাদের অর্থনৈতিক অধিকারের বিষয়টিকে আমরা এখনও সম্মান করি এবং সম্মান করি বলে আমরা তাদের অধিকার, পাবর্ত্য চট্টগ্রামের জনসংহতি সমিতির সংগ্রামকে যথোপযুক্ত এবং যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করছি।

আমরা বলতে চাই, জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, সেই উদ্যোগ অত্যন্ত যথার্থ। এটা শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা নয়, এটা সারা বাংলাদেশের জনগণের সমস্যা। বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নিরাপত্তার কথা বলে, কিন্তু পাবর্ত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে বাংলাদেশের নিরাপত্তাকে রক্ষা করা তার আর সম্ভব হবে না। কাজেই বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অখন্ডতাকে রক্ষার জন্য, বাংলাদেশের নিরাপত্তাকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধান আশু জরুরী। আমরা মনে করি, বর্তমান জামাত-বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার এই চুক্তিকে বাস্তবায়িত করবে বলে আমাদের বিশ্বাস হয় না। তারা রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে ব্যবহার করে এখানকার জনগোষ্ঠীর ন্যায্য অধিকারকে হরণ করার ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে।

আমরা বলতে চাই যে, রাজনৈতিক সংগ্রামের সাথে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের সংগ্রাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশে যদি গণতান্ত্রিক সরকার আসে এবং এদেশে একটি সমৃদ্ধশালী সরকার আসে বা এদেশে প্রগতিশীল সরকার আসে, সেই সরকারই একমাত্র এই চুক্তিকে যথোপযুক্তভাবে সম্মান প্রদর্শন করবে

এবং এটাকে বাস্তবায়িত করবে, সেখানকার জনগণের স্বার্থকে সমুন্নত রাখবে। এখানকার যারা উপস্থিত হয়েছেন, বিশেষ করে বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল বা ১১ দলীয় জোট বা আমরা যারা আজকে আওয়ামীলীগ-জাসদসহ যে আন্দোলন করছি আমরা মনে করছি যে, এখানকার রাজনৈতিক সংগ্রামের জয়লাভের উপর নির্ভর করছে জনসংহতি সমিতির দাবী-দাওয়া জয়লাভের বিষয়টি। কাজেই আমার বিশ্বাস সেই আন্দোলনে জনসংহতি সমিতি অত্যন্ত নীতিনিষ্ঠভাবে থাকবে। আমরাও তাদের দাবির প্রতি নীতিনিষ্ঠভাবে থাকছি- এই কথা বলে আন্দোলনের সাফল্য কামনা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

ইউসুফ আলম, সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আদি ও স্থায়ী বাঙ্গালী কল্যাণ পরিষদ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভার শ্রদ্ধেয় সভাপতি, উপস্থিত বাংলাদেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ, আলোচকবৃন্দ এবং সাংবাদিক ভাইয়েরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আদি ও স্থায়ী বাঙ্গালী কল্যাণ পরিষদের পক্ষ থেকে সংগ্রামী শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

আপনারা জানেন, বিগত ১৯৮৯ সালে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ স্থাপনকল্পে প্রণীত ১৯নং আইন মোতাবেক তিন পার্বত্য জেলাকে বিভিন্ন অনগ্রসর উপজাতীয় অধ্যুষিত একটি বিশেষ এলাকা হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। উপরন্তু উহার সর্বাঙ্গীন উন্নয়নকল্পে উহার জন্য একটি পরিষদ স্থাপনের বিধান করা সমীচিন ও প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে সংসদ কর্তৃক পাশকৃত আইন ১৯৮৯ সনে ৬ মার্চ তারিখে রাষ্টপতির সম্মতি লাভ করে এবং বাংলাদেশ গেজেটে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আজকে যারা বাঙ্গালী দরদী হয়ে বাঙ্গালী সমঅধিকার আন্দোলন-এর ধারকবাহক হিসেবে নেতৃত্ব দিয়ে বিভিন্ন ভূঁইফোড় সংগঠনের নামে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার শান্তিপ্রিয় সহজ সরল স্থায়ী পাহাড়ী-বাঙ্গালীদেরকে ব্যবহার করে অগণতান্ত্রিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তির অগ্রদূত মেহনতী মানুষের কণ্ঠস্বর ও অবিসংবাদিত নেতা ও চুক্তি সম্পাদনকারী শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার বিরুদ্ধে কটাক্ষ ভাষা ব্যবহার করে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্ত পরিস্থিতিকে একটি অরাজক ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদকে বাতিল করার জোর দাবী উত্থাপন করেছেন, তারাই ১৯৮৯ সালে সেই স্থানীয় সরকার পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করে বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে সমস্ত সরকারের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছেন।

আর আজকে তারা দীর্ঘ ১৫ বছর পরে এসে জেলা পরিষদ বাতিল এবং বাঙ্গালী সমঅধিকারের দাবী উত্থাপন করে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের স্বাভাবিক পরিস্থিতিকে ঘোলাতে করেছেন। কেন সেদিন তারা জেলা পরিষদ বাতিল এবং বাঙ্গালী সম-অধিকারের দাবী আদায়ের কথা বলেন নাই। এখন কার স্বার্থে কথা বলছেন এটা তিন পাবর্ত্য জেলাবাসীর প্রশ্ন।

সুধীবৃন্দ, বর্তমানে পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মূল ভিত্তি হচ্ছে এখানকার স্থানীয় সরকার পরিষদ। কাজেই এতে প্রমাণিত হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালী দরদী কতিপয় অর্থ-স্বার্থলোভী, ক্ষমতা লোভী এবং উগ্র সম্প্রদায়িক বাঙ্গালী তাদের হীন স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যাতে বাস্তবায়িত হতে না পারে সেজন্য বাংলাদেশ সরকারকে ভুল পথে ধাবিত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। পার্বত্য জেলার পুরাতন স্থায়ী বাঙ্গালীদের অত্যন্ত পরিশ্রমে গড়া বসত-বাড়ী ও অর্জিত আয়ের অর্থে জায়গা-জমিসহ বাসস্থানের উপর নির্মাণকৃত কাপ্তাই বাঁধ জলবিদুৎ উন্নয়ন প্রকল্প দ্বারা বিদ্যুৎ উন্নয়নে বাংলাদেশ আলোকিত হয়। কিন্তু বাঁধের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত অধিবাসীদের বিভিন্ন

উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধাসহ পুনর্বাসন সমস্যা সুরাহা না করে এই অঞ্চলের বাঙ্গালীদের অস্তিত্ব বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেওয়া অব্যাহত রয়েছে।

প্রিয় সুধীবৃন্দ, অপরদিকে চার দলীয় ঐক্যজোট সরকার বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করে সম্পাদিত ও সইকৃত দেশ-বিদেশে প্রশংসিত ও সমর্থিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে অত্যন্ত সুকৌশলে বিলুপ্ত করে চলেছে। যার ফলশ্রুতিতে চুক্তির (খ) খন্ডের ১০নং ধারাকে লংঘন করে একজন যোগ্য উপজাতীয় ব্যক্তির স্থলে একজন অউপজাতীয় আবদুল ওয়াদুদ ভুঁইয়া এমপিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগদান এবং ঘ খন্ডের ১৯নং ধারাকে লংঘন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে একজন পূর্ণমন্ত্রীর স্থলে একজন উপমন্ত্রী নিয়োগ প্রদান। ফলে আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া এমপি উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানের ক্ষমতা ও অর্থ বলে বিভিন্ন ভূঁইফোড় সংগঠন যেমন- বাঙ্গালী সমঅধিকার আন্দোলনসহ ইউপিডিএফ-এর সশস্ত্র সন্ত্রাসী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক কতিপয় বাঙ্গালীকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মদদ দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিপ্রিয় স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে উস্কানিমূলক উন্মাদনা সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালাচ্ছে; যাতে করে পার্বত্য অঞ্চলের স্থায়ী পাহাড়ী-বাঙ্গালীর ঐতিহ্যবাহী বৈশিষ্ট্য ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সংরক্ষণসহ যুগ যুগ ধরে যে নিবিড় সুসম্পর্ক তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সবাইকে ধন্যবাদ আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

অধ্যাপক এইচ কে এস আরেফিন, শিক্ষক, নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ দেয়ার জন্য। আমি আজকে এসেছি শুনতে। বিষয়টা অত্যন্ত জটিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটা কিভাবে সমাধান করা যায় তা আমি একজন একাডেমিক হিসেবে দেখার চেষ্টা করবো। সত্যিকার অর্থে সমস্যাটা হচ্ছে ঈঁষঃঁৎধষ চৎড়নষবস। অবশ্য ঈঁষঃঁৎব-এর সাথে রাজনীতি যুক্ত। এই প্রেক্ষাপটে আমি যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেবো সেটা হলো মানুষ বা নৃ-বিজ্ঞান যেটি হচ্ছে আমার বিষয়। একটা বিষয়ে আমার কোন দ্বিধা নেই যে, সেটা হলো যে, আসলে আমরা মানুষ সব এক জায়গা থেকে এসেছি এবং এই বিশ্বাসটা যদি আমরা মেনে নিই তাহলে কিন্তু সমস্যাটা অনেক অংশেই নিরসন হয়ে যায়। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমরা সেটা মানি না। আমরা মনে করি যে, মানুষ কেউ বড় কেউ ছোট; বিভিন্নভাবে দেখা হয়ে থাকে।

আজকে বিশ্বব্যাপী সমস্যাটা হচ্ছে আদিবাসী সংক্রান্ত সমস্যা। আমরা পছন্দ করি আর না করি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আদিবাসীদের নিগৃহীত করা হয়েছে এটা কিন্তু সত্যি কথা। দেখা গিয়েছে যে, আমেরিকার মত জায়গায়ও আদিবাসীদেরকে যেমন পপদের রিয়েল কোম্পানী আদিবাসীদের কাছ থেকে একর প্রতি ৫০ সেন্ট জমি দামে কিনে নিয়েছে এবং তার সাথে তাদেরকে ডযরংযশু দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা ডযরংযশু খাও। এভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আদিবাসীদেরকে ঠকানো হয়েছে। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আমাদের ভুললে চলবে না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একই রকম ঘটনা ঘটেছে। আদিবাসীদেরকে ভিন্নভাবে দেখার প্রক্রিয়া আমাদের মধ্যেও ছিল। তার একটা নিদর্শন আমরা দেখতে পাই আমাদের সংবিধানে। সংবিধানে আদিবাসীদের স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। এদেশের নাগরিক হিসেবে তাদেরকে স্বীকার করা হয়নি। এখানে অনেক রাজনীতিবিদ আছেন এবং বিভিন্ন সুশীল সমাজের প্রতিনিধি আছেন আমাদের সকলেই এ ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত। আদিবাসীদের স্বীকৃতি দিতে হবে। তাদেরকে ভিন্নভাবে দেখার সমস্যা থেকে অন্যান্য সমস্যাগুলো তৈরী হয়েছে।

দ্বিতীয় ব্যাপারটা হলো যেটা ডঃ কামাল হোসেন সকালবেলায় বলেছেন যে, এই শান্তিচুক্তি একটা অর্জন। এটা আদিবাসীদের অর্জন নয়, এটা এদেশের মানুষেরও অর্জন। কারণ শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা মানুষের অধিকারের কথা বলতে যাচ্ছি। আজকের সমস্যাটা হলো অধিকার থেকে

মানুষকে বঞ্চিত করা। অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রক্রিয়া অব্যাহতভাবে ঘটছে। যার জন্যই আজকে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি। আমি বলবো শান্তিচুক্তি একটা বড় মূল্যবান দলিল যার মাধ্যমে মানুষের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক যে, গত সরকারের আমলে সেটা ঠিকমত বাস্ত বায়িত হয়নি। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, চুক্তি সম্পাদন করা এক কথা আর তা বাস্তবায়ন করা আরেক ব্যাপার। চুক্তি বাস্তবায়ন করা খুব দুরূহ ব্যাপার। কারণ চুক্তি বাস্তবায়ন করতে মানুষের সামাজিক সংগঠন, মানুষের বিভিন্ন সম্পর্কগুলো এখানে চলে আসে। তার সাথে যুক্ত রাজনীতি, অর্থনীতি, মতাদর্শ এই বিভিন্ন বিষয়গুলো চলে আসে।

আজকে চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু আমাদেরকে এ প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে। একদিন না একদিন আমরা এই চুক্তি বাস্তবায়িত করতে পারবো। আমাদের বেশী আশাবাদী হলেও চলবে না যে, আজকে চুক্তি হয়েছে আজকেই সবকিছু বাস্তবায়িত হবে। কারণ যে সমস্যাগুলো আসতেছে সেগুলো মানবিক সমস্যা। সেগুলো নিরসন করা হঠাৎ করে সম্ভব নাও হতে পারে। তার জন্য সময়ের দরকার।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে, আজকে দেশে যে সরকার আছে দুভার্গ্যজনক হলেও সত্য যে সেটা হলো একটা সাম্প্রদায়িক সরকার। এই সরকার থেকে কোন মতেই আমরা আশা করতে পারি না যে, শান্তি চুক্তি বাস্তবায়িত হবে। কারণ যে সরকার প্রথমেই শুরু করেছিল বিছমিল্লাহ দিয়ে। সেখানেই বিভাজন তৈরী হয়েছে এবং সেখানে অন্য মানুষের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। সেখানে অন্য মানুষের অধিকার থাকার কথা নয়। মতাদর্শগত বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই সরকারের কাছে চুক্তি বাস্তবায়ন চাইলেই হবে না। যেখানে তারা বলছে যে, তারা মুসলিম জাতীয়তাবাদী। মুসলিমদের কথাই এখানে বলা হয়েছে।

অন্যদিকে আমরা এই বাংলাদেশকে চাইনি। আমরা বাংলাদেশকে চেয়েছিলাম একটা ঝবপঁষধৎ রাষ্ট্র হিসেবে এবং এই মতাদর্শকে নিয়েই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। এটা দুভার্গ্যজনক হলেও সত্য যে, আজকে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে রাজাকাররা মন্ত্রীর গাড়ীতে চড়ে যায়। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। এ সরকার থেকে আমরা খুব বেশী আশা করতে পারি না। সে যাই হোক আমি যে কথাটা গুরুত্ব দেবো সেটা হলো যে, শান্তিচুক্তি একটা মূল্যবান দলিল এবং এটা বাস্তবায়িত করতে হবে। এজন্য আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা যারা একাডেমিকস আছি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি আছেন, রাজনীতিক আছেন, সাধারণ জনগণ আছেন তাদের সকলের এগিয়ে আসতে হবে। কারণ এই অধিকার শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকদের জন্য নয় বা শুধু আদিবাসীদের নয়, এই অধিকারটা আমাদের সকলের। এই অধিকারটা মানুষের অধিকার এবং এই অধিকারের জন্য আমরা নিরন্তর সংগ্রাম করছি।

আমি আর বেশী কিছু বলবো না। আমি আশাবাদী যে, পার্বত্য শান্তিচুক্তি হয়েছে সেটা বাস্তবায়িত হবে এবং আমরা একদিন মানুষের অধিকার অর্জন করবো। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে।

অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যাবিদ্যালয়

এখানে অনেক গুরুজন আছেন, সম্মানিত ব্যক্তি আছেন, আমার বন্ধু-বান্ধবও আছেন সকলে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিন। আমার এখানে আসা একান্তই কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে; সেটা এক নম্বর। দু নম্বর, আমি পাহাড়ী জনগোষ্ঠীকে আমার নিজের মত করে ভালোবাসি। কারণ আমাকে একবার একাডেমিক কাজে একটা জরিপ চালাতে হয়েছিল মুরংদের ভিতরে। তখন কিছুটা প্রত্যক্ষভাবে দেখার সুযোগ হয়। তখন বুঝলাম, সভ্যতা কত রকমের হয়। কতক ব্যাপারে আমাদের চেয়ে পাহাড়ীরা বেশী সভ্য। কিন্তু আমরা চিরকালটাই বলে এসেছি যে, তারা সভ্য নয়।

আজকে সঠিক আলোচনা হচ্ছে। আমি অনেক উপকৃত হয়েছি। মণিস্বপন দেওয়ান বলে গেলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যাপারটি আসলে খুবই জটিল। বৃটিশ আমল থেকে অসংখ্য বই লেখা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে; যারা ঐ এলাকা শাসন করতে এসেছে তারা নানা ধরনের ঊীঢ়বৎরসবহঃ করেছেন এবং ঊীঢ়বৎরসবহঃ করে তারা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এই জায়গাটা এদের মত করে পরিচালনার ভার ওদের (আদিবাসীদের) হাতেই দিতে হবে। আমরা যত শক্তিমানই হই এই ব্যাপারটি সামলাতে পারবো না। সামলাতে না পারার একটি মূল কারণ কিছু তত্ত্বীয় (ঈড়হপবঢ়ঃঁধষ)। যেমন ধরুন জমি বিষয়ে ধারণা। আমাদের জমি সম্পর্কে ধারণা আর পাহাড়ীদের জমি সম্পর্কে ধারণা এক নয়। আমাদের সময় সম্পর্কে ধারণা অফ্রিকার বহু অঞ্চলের মানুষের সময় সম্পর্কে ধারণা এক নয়। যাদের জমির ধারণা অন্যরকম তাদেরকে যদি আমার জমির ধারণা দিতে চাই যে- দলিল লাগবে, কাগজ লাগবে, অমুক-তমুক লাগবে তাহলে সে এ ব্যাপারে কিছুই বুঝবে না। ফলে তাদের ঠকাতে সুবিধা হয়। জমি সংক্রান্ত আইন-তাইন ইত্যাদি তারা বুঝবে না। তাই কিনে নিতে সুবিধা হয়েছে।

বস্তুতঃ পাকিস্তান আমলে প্রথম চক্রান্ত শুরু হয়। আমরা সর্বক্ষেত্রে যে অপরাধী এ কথাটি বাঙ্গালীদের স্বীকার করা দরকার। আমি যখন মাষ্টারি করি, তখন অবশ্য শান্তিচুক্তি হয়নি, তখন ক্লাশে ছাত্র আমি অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি কিন্তু কখনোই বুঝাতে পারিনি যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষদের উপর খুবই অন্যায় করা হচ্ছে। কাজেই আত্মরক্ষার জন্যই তাদের যুদ্ধ করতে হচ্ছে। এগুলো তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। কারণ হলো আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এই সমভূমির মানুষেরা পাহাড়ীদের সঙ্গে কখনই আপন করে নিতে পারিনি। এর ফলে তাদের সাথে সামাজিক দূরত্ব বা সম্পর্কের দূরত্ব সব সময় ছিল। এটা আমরা কেউ কখনো ভালোমতো বুঝতে পারিনি। যেমন আমি মনে করি না যে, যখন সংবিধান করা হয় তখন বঙ্গবন্ধু খুব ইচ্ছা করেই তাদেরকে বাদ দিয়েছে। আমার ধারণা যে, সচেতনভাবে মনের মধ্যে ছিল না। আবার কেউ হয়তো মনেও করিয়ে দেননি। ফলে বিপর্যয়টা ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে।

সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদকের (গোলাম মোর্তজা) কথা সত্যি খুব ভালো লেগেছে। এরকম কিছু কিছু বিষয় আলোচনায় আসা উচিত। আমরা একথা কেন বলছি না যে, ঐ এলাকায় যে সকল আর্মী মানুষজন রয়েছে তাদের প্রত্যক্ষ মদদ রয়েছে। এই কথাটা বলা দরকার। বাংলাদেশের যে সরকারই আসুক না কেন, এখানে অনেক মন্ত্রী আছেন বা মন্ত্রী ছিলেন, আমরা প্রত্যেকেই ক্যান্টনমেন্টকে ভয় পাই। এই দেশে গণতন্ত্র কখনও আসবে না যতক্ষণ না সরকার মানুষজনকে বলবেন যে, ক্যান্টনমেন্টকে ভয় পাবো না। এটা এক ধরনের গরহফ ংযধফব। এটা পাকিস্তান আমল থেকে হয়ে আসছে। উর্দি দেখলেই ভয় পায়। এই উর্দি চলে গিয়েছিল। আবার অন্যভাবে উর্দি এলো। এখানে আমাদের মধ্যে একটা মনোজাগতিক কাজ করে। যে সরকারই আসুক না কেন এটা অস্বীকার করতে পারবে না। এটাতো লংকায় গিয়ে সবাই রাবণ হয়ে যাওয়ার অবস্থা। ফলে ব্যাপারটি আসলে খুবই জটিল। সোজাভাবে এটা হাওয়ার ব্যাপার নয়।

আর এ বিষয়ে সন্তুবাবুরা ভালো করেই জানেন যে, অধিকার কেউ কাউকে দেয় না। অধিকার আদায় করে নিতে হয়। যেভাবেই হোক, দলিলপত্রে-কাগজে বা আন্দোলন করে, সে আন্দোলন সশস্ত্র বা নিরস্ত্র যেভাবেই হোক, অধিকার আদায় করেই নিতে হয়। আমি খুব ক্ষুদ্র সাধারণ মানুষ, আমি কোন নেতা নই, রাজনীতিবিদও নই। আমি যে কথাগুলো বললাম কান্ডজ্ঞানের বশবর্তী হয়েই বললাম। সবাইকে ধন্যবাদ।

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ এবং সুধী মন্ডলী। আলোচনা অনেক হয়েছে। এরকম আলোচনায় আমি অনেক অংশগ্রহণ করেছি। আলোচনার মাধ্যমে এ রকম সমস্যা সমাধান হয় বলে আমি বিশ্বাস করি না। বক্তা আরো অনেক আছেন। আমি তিনটি পয়েন্টে আমার আলোচনা সংক্ষেপে উত্থাপন করবো। এক নম্বর হচ্ছে- যে সরকার ক্ষমতায় আছে তা হচ্ছে ঘোর সাম্প্রদায়িক সরকার। তার সাথে আছে জামায়াতে ইসলামী এবং তারা চুক্তির বিরোধিতা করে আসছে। ফলে তাদের কাছ থেকে আমরা খুব একটা আশা করতে পারি না। প্রশ্নটা হচ্ছে সেখানে তার বাইরেও বাংলাদেশে নেতা, রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবীরা আছেন তাদের মানসিকতার পরিবর্তন করা দরকার বলে আমি মনে করি। আমাদের মধ্যে বাঙ্গালী সোভেনিজম আছে। তার সঙ্গে অবশ্য কায়েমী স্বার্থপরতার দিকটাও জড়িত আছে। যে কারণে আমাদের সংবিধানে আদিবাসীদের এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর একটা স্বতন্ত্র জাতীয় স্বীকৃতি আসেনি।

দুই নম্বর সবচেয়ে বড় সমস্যাটা হচ্ছে- পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় একটি অঘোষিত সেনাশাসন প্রথম থেকেই চলে আসছে এবং এখনও চলছে। এ চুক্তি হওয়ার পরও অঘোষিত সেনাশাসন চলছে। সেখানে সেনাক্যাম্প আছে, ব্রিগেডিয়ার আছে, সৈন্যবাহিনী আছে। তারাই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে কতটুকু গণতন্ত্র আছে না আছে সেরকম বিতর্ক থাকতে পাবে। যতটুকু আছে তার সামান্যতমও সেখানে নাই।

আমি আমার ছোট্ট একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। এটা বোধ হয় এরশাদ আমল হবে ৮০ দশকের মাঝামাঝি কোন একসময় আমি চিটাগাং থেকে রাঙ্গামাটি যাচ্ছিলাম। পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় ক্যাম্প এবং কিছু দূর পর পরই আমাদের থামানো হচ্ছে। থামিয়ে চেক করা হচ্ছে। একবার চেক করে বলা হচ্ছে, না না এখানে সব বাঙ্গালী আছে ওরা নাই। আমি নিজে ছিলাম সেখানে আমার নিজেরও মনে হয় যেন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাই। মনে হলো ঠিক পাকিস্তানিরাই আমাদেরকে এভাবে চেক করতো। ঠিক একই জিনিস ঘটাচ্ছি আমরা। তার পরই বিবিসির চ্যানেল ফোর একটা জরিপ (ওহঃবৎারবা) নিয়েছিল আমি তখনও সেই কথাটিই বলেছিলাম। খুব দুঃখজনক যে, ১৯৭১ সালে আমরা পাকিস্তানীদের দ্বারা যেভাবে নিগৃহীত হয়েছিলাম, পাকিস্তানীরা আমাদের উপর যা করেছে আজকে স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা ঠিক একই রকম ঘটনা ঘটাচ্ছি বাংলাদেশেরই অন্তর্ভূক্ত একটি অংশে।

তিন নম্বর আরেকটা বড় সমস্যা সেটা হচ্ছে ভূমি সংক্রান্ত সমস্যা। ভূমি সংক্রান্ত সমস্যাটা জটিল; আবার জটিল নয়ও। এটা নির্ভর করে আমার দৃষ্টিভঙ্গির উপর। এখানে সেটেলার দ্বারা যে সমস্যাটা সৃষ্টি হয়েছে সেটা একেবারে যে সমাধানযোগ্য নয় আমি মনে করি না। বাইরে থেকে যাদের নিয়ে আসা হয়েছে তারা গরীব মানুষ ঠিক আছে। কিন্তু তাদেরকে আজকে ঠিক বিহারীদের যেভাবে ব্যবহার করতো আমাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানীরা, অনেকটা একই কায়দায় আমরা যদি সেই জিনিসটা করতে যাই সেখানে সুস্থ সমাধান আসবে না বা আসতে পারে না।

সমস্যাটা সমাধান করা যায় যদি সেটেলারদের যাদেরকে সেখানে ঝবঃঃষবফ করা হয়েছে তাদেরকে যদি জব-ংবঃঃষবফ করা যায় অন্যত্র। চেষ্টা করলে আমরা এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাও পাবো। এটা সম্ভব বলে আমার কাছে মনে হয়। তিনটি জায়গায় যদি আমরা কেন্দ্রীভূত করতে পারি, আজকে যারা সরকার চালাবে তাদেরকে বাদ দিয়েও সরকারের বাইরে আমরা যারা আছি তারা সবাই যদি একমত হতে পারি মানসিকতার দিক থেকে এবং আন্তরিকভাবে এবং একাত্মভাবে লড়াই করতে

পারি তাহলে আমার মনে হয় সমস্যার সমাধান আছে। আমি সংক্ষেপে এই বলে বিদায় নিচ্ছি। সবাইকে ধন্যবাদ।

পংকজ ভট্টাচার্য, প্রেসিয়াম সদস্য, গণফোরাম

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের সপ্তম বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে আজকে জনসংহতি সমিতি এবং বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম কি পেয়েছেন, কি পাননি তার একটা খতিয়ান তুলে ধরেছেন। আমরা যারা তাদের সংগ্রামের সাথে সমব্যাথী, সাথী তারাও আজকে আলোচনায় যুক্ত হয়েছি। আগামী বছর অষ্টম বর্ষে আবার আলোচনা হবে। শুধুই বছর বছর চুক্তির সালতামামি হবে আর আলোচনা করবো ক্ষোভ-বিক্ষোভ-হতাশা ব্যক্ত হবে এটাই কি চলতে থাকবে? এটা আমি ভাবছিলাম বসে বসে।

খুব মূল্যবান আলোচনা হয়েছে। আমার কাছে বিষয়টা একটা জটিল হলেও সবকিছু ঠিক আছে। এরকম জটিলতা বহুরাষ্ট্রে আছে। পার্শ্ববর্তী দেশে এ রকমের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সমস্যা নিয়ে তাদের সাংবিধানিক গ্যারান্টি দিতে হচ্ছে। দুই দশকের মধ্যে, এক দশকের মধ্যে দু'টো জাতিগোষ্ঠীর সমস্যার দিক খুঁজছে তারা। যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্র চালু আছে সেখানে এটা মীমাংসা করা যায়। যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্র নেই সেখানে কি করে করবে? এখানে সন্তু লারমাকে আমরা কি বুদ্ধি দেবো? প্যালেষ্টাইনে শান্তিচুক্তি হয়েছে। শান্তিচুক্তির পর প্যালেষ্টাইনের অবিসংবাদিত নেতাকে তিন বছর বন্দী জীবনযাপন করতে হয়েছে তার স্বভূমিতে।

চুক্তির স্বপক্ষে আমরা যারা আছি, জাতিগোষ্ঠীর অধিকারের সমর্থক আমরা যারা আছি আমরা কি প্রতিশ্রুতি উনাকে দিতে পারি? আমার সামনে ইয়াসির আরাফাতের অবস্থা দেখলাম। পার্বত্য চট্টগ্রামের লড়াইকে আমি মিলাতে চাই ফিলিষ্টিনদের সাথে। ফিলিষ্টিনরা একটা স্বপ্ন দেখেছেন। তাদের দীর্ঘ যুগ লড়াই করতে হয়েছে। তারা ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জন্য লড়াই করেছে।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সুযোগ্য ভ্রাতা আজকের এই আন্দোলনের পুরোধা তিনি জুম্ম জাতিগোষ্ঠীর অধিকার চাচ্ছেন, স্থায়ী বাঙ্গালী অধিবাসীদের অধিকার চাচ্ছেন, সমতলসহ সারাদেশের আদিবাসী এবং গরীব কৃষক, শ্রমিক, অধিকার বঞ্চিত বাঙ্গালী জনগণের অধিকার লড়াইয়ের সংগ্রাম এক অবিভাজ্য মনে করছেন। তিনি একটা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর দৃষ্টিতে দেখছেন না। তিনি মনে করছেন একটা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশই দিতে পারে এর সমাধান। যেমন ভাবতেন ইয়াসির আরাফাত। প্যালেষ্টাইন সমস্যার সমাধান কিভাবে হলো দেখতে হবে। বাংলাদেশের পার্বত্য চুক্তির সমস্যার সমাধান কিভাবে হবে সেটাও দেখতে হবে আমাদের।

আমরা বিশ্বাস করি জনতার শক্তিতে। সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে আমরা লড়াই সংগ্রামে বিশ্বাস করি। আমাদের আর কোন শক্তি নেই। কেউ কেউ বলবেন লবিং, কেউ কেউ বলবেন সমঝোতা, জাতীয় আলাপ আলোচনা করেই এগুলোর একটা সমাধান করতে হবে। এগুলো আংশিক কিছু প্রভাব ফেলতে পাবে। লবিং দিয়ে এ ধরনের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আদায় হয়নি কোন দেশেই। মন্ত্রী সাহেবের সীমাবদ্ধতা বুঝি। তিনি এ জাতিগোষ্ঠীর হয়ে কি যে কঠিন সমস্যায় আছেন তা বুঝি। সেখানে কুড়ালকে কুড়াল বলতে হবে। দু'তিনটি সমস্যা আছে সেগুলো মীমাংসা না করে এ সমস্যার সমাধান হবে না।

যারা চুক্তিকে মানেন না তারা তো বিরোধীতা করে চলছেনই। তারা চুক্তিকে বিশ্বাসই করে না। আগে যারা চুক্তির পক্ষে ছিলেন তাদের চিন্তা ছিল কোনমতে চুক্তিটা করে যায় তারপরে যা হবার তা হবে। তারা আন্তরিকভাবে চুক্তি বাস্তবায়ন চায়নি। চাইলে যথেষ্ট ছিল তিন বছর। অন্তত মূল কয়েকটি বিষয়

যেমন- পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা কার্যকরকরণ। এটা বাস্তবায়ন করতে পারতো। আমি চুক্তি করেছি আমি এই অধিকারটা দেবো না এটা হতে পারে না। এটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য।

আমাদের মনস্তাত্ত্বিকের মধ্যে বাঙ্গালিয়ানা, বাঙ্গালী বর্ণবাদ আমাদের মনস্তত্ত্বে ঢুকে আছে। এখন যারা চুক্তি বিরোধীতা করছে তারা শত্রুপক্ষ আমি সরাসরি বলতে চাই। চুক্তির বিরুদ্ধে লংমার্চ করেছে। তারা এখন চুক্তি বানচাল করার জন্য উঠে পড়ে নেমেছে। তারা চুক্তিকে পদদলিত করে উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে একজন বাঙালীকে বসিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে এই জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে থেকে একজন পূর্ণমন্ত্রী হবেন এটা চুক্তির কথা। এটা বরখেলাপ করা হয়েছে একজন পূর্ণমন্ত্রী না করে। চুক্তির বরখেলাপ করেই যাচ্ছে তারা।

আর ইয়াসির আরাফাতের রামাল্লার বাসভবনে বোমাবর্ষণ করাটার বাকি আছে তাদের। আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে এগুলো বলছি আপনারা ভুল বুঝবেন না। এখন হিসাব রাখতে হবে যে, কবে সন্তু লারমার বাসভবনে বোমাবর্ষণ হবে। কারণ আমি সেদিন পত্রিকায় দেখেছি যে, গোলাম মোর্তজা ব্যাখ্যা করেছেন, শাসকগোষ্ঠী ঐ ঘটনাটি ঘটিয়েছিল। সেই ঘটনার পরে হেলিকপ্টার থেকে এয়ার স্ট্রাইক হয়েছে। একটা স্বাধীন দেশে এয়ার স্ট্রাইক শুরু হয় ভাবতে অবাক লাগে।

এই শাসকগোষ্ঠী বুঝতে পারছেন না, তারা আরেকটা ঐতিহাসিক ভুল করতে যাচ্ছে। তারা সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে মদদ দিয়ে চলেছে। তার অর্থ হলো শান্তিচুক্তি আমরা মানবো না, সন্তু লারমাকে আমরা ক্রমশ উত্তপ্ত করবো, তার সঙ্গীদের আমরা একের পর এক হত্যা করবো। আমরা বিভিন্ন ফ্রন্টে নামিয়েছি। তার মধ্যে কিছু বিভ্রান্ত পাহাড়ী বন্ধুগণ নামিয়েছি। তারা বুঝতে পারছে না।

পাহাড়ী বন্ধুগণ, আপনারা উস্কানীতে প্ররোচিত হয়ে কাজ করবেন না। দরকার হলে অস্ত্র হাতে নিলে পরিকল্পিতভাবে নেবেন। প্ররোচিত হয়ে নেবেন না এবং দুনিয়ার মানুষ আপনাদের পাশে থাকবে। সারাদেশের মানুষ আপনাদের পাশে থাকবে। উস্কানী দিতে দিতে ক্রমশ একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে এরা বুঝতে পারছে না। বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার, বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করার, জাতীয় নিরাপত্তাকে ধ্বংস করার রাস্তায় তাদেরকে শাসকগোষ্ঠী নিয়ে নিচ্ছে। এই শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার উপর হামলা করে। বাধ্য করে তাদের অস্ত্রের পথে যেতে। শাসকগোষ্ঠী এইবার আর লড়াই করে আবার চুক্তির পথে আসার জায়গা থাকবে না, এই লড়াইয়ের মধ্যেই সমাধান হবে এটার। অশুভ ভবিষ্যতের দিতে ঠেলে দিচ্ছে এই শাসকগোষ্ঠী।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লড়াই এটা সন্তু লারমার একার লড়াই না। এটা জনসংহতি সমিতির লড়াই না, জুম্ম জাতিগোষ্ঠীর লড়াই না, খালি আদিবাসীদের লড়াই না এটা বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতির লড়াই, এটা একটি জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার লড়াই। সেই লড়াইয়ে সমস্ত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। এটাকে জাতীয় দাবী হিসেবে লড়াই করতে হবে।

সামরিক শাসন বাংলাদেশের এক-দশমাংশ অঞ্চলে চলবে না। এটা পরিস্কার করে বলতে হবে। নাক্ষ্যংছড়ির অস্ত্র চোরাচালান, নাক্ষ্যংছড়ির ঘটনা ঢাকা থেকেই হয়। সেখানে অপহরণগুলো ঝবঃঃষবফ হয় সেনাবাহিনীর মাধ্যমে। এটা আজ পরিস্কার। এসব সমস্যা যতক্ষণ না সমাধান হবে ততক্ষণ এই সেনাশাসন বন্ধ করা যাবে না। সেক্ষেত্রে জাতীয়ভাবে অভিন্ন দাবী উঠতে হবে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক শাসন চলবে না। চুক্তি করতে হয়েছে সামরিকভাবে সমাধান সম্ভব না হওয়ায়। সামরিকভাবে সমাধান হবে না। রাজনৈতিকভাবে সমাধান করতে হবে এ সমস্যাকে। সেই রাজনৈতিক সমাধান করার পরে কেন সামরিক বাহিনী সেখানে থাকবে? কেন ক্যাম্পগুলো গুটানো হবে না? স্থায়ী ক্যান্টনমেন্টগুলো তো থাকবেই। কিন্তু বাকি অস্থায়ী ক্যাম্পগুলো? পাঁচশ ক্যান্টনমেন্ট

থাকার তো কথা না। কল্পনা চাকমা ধর্ষিত হবে, পাহাড়ীরা অত্যাচারিত হবে, পদে পদে পাহাড়ীদের গাড়ী থেকে উঠানো-নামানো হবে এটা সারা জীবন চলতে থাকবে?

প্রথম আলো, সংবাদ এই সমস্ত পত্র-পত্রিকায় কলাম লেখেন সেনাবাহিনীর প্রাক্তন অফিসাররা। বলেন নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনী রাখতে হয়। কিসের নিরাপত্তা? চুক্তি বাস্তবায়ন না করে কিসের সিকিউরিটি? ঐ বার্মার বিদ্রোহীদের অস্ত্র যোগাবে? আমি জেলে ছিলাম। আমার সাথে ছিল কাশিম রাজা। এই কাশিম রাজা পাকিস্তান গভর্ণমেন্টের সহায়তা করেছে। আমি জেলে ছিলাম ৬৪-এ। সেখানে আমার সাথে ছিল পিন্টো। সেই পিন্টো, রাতে তাকে নিয়ে যাওয়া হতো নানা অপারেশন নাম করে, আবার ভোর রাতে পৌঁছিয়ে দিতো জেলখানায়। সব গভর্ণমেন্ট সহায়তা করেছে সেই তথাকথিত বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আর অস্ত্রের চোরাচালানী ব্যবসা করেছে এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে একটি অংশ এই ব্যবসার সাথে জড়িত এবং তার সাথে প্রভাবশালী লোক জড়িত থাকে।

এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে হলে সেনাক্যাম্প গুটিয়ে নিতে হবে। এটার জন্য আজ জাতীয় ঐক্যমত দরকার। অন্ততঃ এখানে সুশীল সমাজের যারা আছেন, আগামীতে ক্ষমতায় যাবেন তারা এ বিষয়ে আরো সোচ্চার হবেন এই আহ্বান জানাচ্ছি।

দ্বিতীয় সমস্যা হলো ভূমি সমস্যা। এ সমস্যা অবিলম্বে সমাধান করতে হবে। চুক্তিতে পরিস্কারভাবে উল্লেখ আছে ঐ অঞ্চলটা উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চল হবে। ঐতিহাসিকভাবে এটা জুম্ম জাতিগোষ্ঠীর অধ্যুষিত অঞ্চল। জুম্ম জাতিগোষ্ঠী ছাড়া কেউ জমি হাতে রাখতে পারবে না, হস্তান্তর করতে পারবে না। তাদের এটা সমষ্টিগত ভূমি হিসেবে ব্রিটিশ আমল থেকে আইনে স্বীকৃত আছে। পাকিস্তান আমলেও আংশিক স্বীকৃতি আছে। এটা স্বীকৃতি দিতে হবে।

তৃতীয় সমস্যা হলো শরণার্থী (সেটেলার) সমস্যা। তাদেরকে কামানের গোলা হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে আসছে। তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। এটা অলিখিত চুক্তি ছিল। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এগিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এজন্য বাঙ্গালীদেরই বলতে হবে, সুশীল সমাজকে বলতে হবে, সমগ্র জাতিকে বলতে হবে। আমার কথা এখানেই শেষ। সবাইকে ধন্যবাদ।

মামুনুর রশীদ, বিশিষ্ট নাট্যকার

সবাইকে ধন্যবাদ। আমি অন্যভাবে হতাশ হয়েছি। কারণ রাজনীতিবিদেরা একই কথা একটা কলের গানের মত বলে চলেছেন এবং তার মধ্যে সমাধানের কোন ইঙ্গিত নেই। এখানে ষাটের দশকের ছাত্র নেতারা উপস্থিত আছেন, আশির দশকের নেতারা উপস্থিত আছেন, তাদের সাহস এবং মেরুদন্ড সোজা ছিল। কিন্তু সেটা কি করে গত তের-চৌদ্দ বছরে বাঁকা হয়ে গেল বুঝতে পারলাম না। মোর্তজা একজন সাংবাদিক হয়ে যত স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারলেন তারা সেটা বলতে পারলেন না।

এখানে একটা সাংস্কৃতিক সমস্যা রয়েছে। আমার মনে হয় রাজনীতিবিদদের জন্য এটা আরও অনেক বেশী। কারণ উনাদের কোন মনসংযোগ নাই, কোন বিষয় নিয়ে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত ভাবনায় যেতে পারেন না। এটা একটা বড় সমস্যা হয়ে গেছে। আমি যদিও সাংস্কৃতিক কর্মী এবং আমাদের ক্ষমতা খুবই সীমিত কিন্তু তার পরও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমাদের সাংস্কৃতিক জোট থেকে সেকুলার সমাজের কথা বলা হচ্ছে। আসলে আমাদের সমাজ কি অত্যন্ত নন-সেকুলার (সাম্প্রদায়িক) হয়ে গেছে? আমাদের সমাজের উপরে, সমাজের গভীরে কোথায় যেন আমাদের সমাজটা আমাদের অজান্তে হোক, জানতে হোক একটা সাম্প্রদায়িক সমাজ হয়ে গেছে। এটা পাল্টানোর জন্যে আমাদের রাজনীতিবিদরা কি ভূমিকা পালন করেছেন?

আমি আজকে খুব সবিনয়ে জিজ্ঞেস করতে চাই যে, পংকজ দা এখানে খুব চমৎকার বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু তৃতীয় পক্ষের মানুষজনকে এই পার্বত্য শান্তিচুক্তির ভেতর কি আছে সেই জিনিসটা বোঝানোর জন্যে কি রাজনৈতিক কাজ করেছেন? এমনকি আমি তোফায়েল ভাইকেও প্রশ্ন করতে চাই যখন শান্তি চুক্তি হতে যাচ্ছে তখন আওয়ামীলীগ বাংলাদেশের কোথাও জনসমাবেশ করেনি। আমরা প্রথম সাংস্কৃতিক জোট থেকে শহীদ মিনারে এই কাজটা করি। আমরাই প্রথম রাঙ্গামাটিতে যাই স্টেডিয়ামে যেখানে আমাদের উপর বোমা হামলা হলো। আমরা খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবানে যাই এবং মানুষের পাশে গিয়ে দাড়াঁবার চেষ্টা করি।

যখন আলফ্রেড সরেন মারা গেলো তখন আমাদের বামপন্থী নেতারা অবশ্যই গিয়েছিলেন। তখন আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় ছিল। কিন্তু তার বিচার কি হয়েছে? শুনেছি যারা তার হত্যাকারী আজকে তারা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হয়েছে। কিন্তু আলফ্রেড সরেনের হত্যার কোন বিচারই হলো না। যাই হোক আমার মনে হয়, আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, রাজনৈতিক কাজ আমাদের সমাজে খুব কমে গেছে। এটা না বাড়ালে আমার মনে হয় শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের সমস্যা কেন, কোন সমস্যাই সমাধান হবে না।

বাংলাদেশে মূলস্রোতধারার রাজনীতিটা- যেখানে বামপন্থীরা আছেন, আওয়ামীলীগরা আছেন, আরো অনেক দল আছেন, এই জায়গাটা যদি ঠিক না করা যায় এবং মানুষকে যদি আমরা আমাদের পক্ষে না আনতে পারি আমরা বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বো। এই বিষয়টা বোঝানোর জন্য রাজনৈতিক দলসমূহের যে কর্মসূচী খুব জরুরী সেটার অভাব রয়েছে।

আমরা সেই ষাটের দশকে দেখেছি, পরবর্তীকালেও দেখেছি, এই বামপন্থী রাজনীতির ক্ষেত্রেও দেখেছি, মানুষের মধ্যে যে পারস্পরিক সংযোগ ছিল, মানুষের মধ্যে যে রাজনৈতিক কার্যক্রম ছিল তা সাংঘাতিকভাবে কমে গেছে। এখন ভাড়াটে দিয়ে মিছিল হয়। জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোই এটা করে। মান্নান ভুইঁয়া সাহেব একদিন আমাকে বলছিলেন যে, আওয়ামীলীগের মিছিলের সামনে যেতে আমার ভয় হয়। কেন? কারণ আগে মিছিলের সামনে যারা থাকতো যেমন তোফায়েল থাকতো, তোফায়েল তো আমাকে মারবে না। তোফায়েল এবং আমি অভিন্ন। এখন তোফায়েলদের পরবর্তী নেতৃত্বের সাথে আমার পরিচয় নেই। যারা এখন নেতৃত্ব দেয় তাদেরকে আমি চিনি না । তাই ভয় হয়।

আবার আওয়ামীলীগের বন্ধুরাও যখন দেখতে পান, বিএনপির যখন মিছিল আসে তাদের কাউকে আমরা চিনি না। বরং সেখানে জামায়াতের মিছিল থাকে। তাদের সামনে পড়ে গেলে তো আর কথাই নেই। মনে হয় যেন এখনই মেরে ফেলবে। এই রাজনৈতিক সংস্কৃতিটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে এটা কিন্তু ভাববার বিষয়। সে কারণে আমি বলবো রাজনৈতিক সংস্কৃতি বা পারস্পরিক সংলাপ বাড়ানো দরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাগুলো খুব খোলাখুলি বলা দরকার। সেনাবাহিনী নিয়ে যেসব প্রশ্নগুলো উঠে এসেছে সেগুলো নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সরাসরি বলতে হবে। শুধু বললেই হবে না, এর পক্ষে জনসমর্থন সংগ্রহ করতে হবে। সেই জায়গাতে কোন কাজ হচ্ছে না বলে আমার মনে হয়।

আর একটা জিনিস হচ্ছে যে, আমাদের রাজনীতিবিদরা যে ঘরানাই হোক না কেন, আমরা তো রাজনীতি করতে পারবো না, কারণ আমাদের চামড়া খুব পাতলা। খুব সহজেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বসি। রাজনীতিবিদরা তা পারেন কারণ তাদের চামড়া মোটা হয়ে গেছে। কথা শুনতে শুনতে হজম করতে করতে তারা সবকিছু সহ্য করতে পারেন। কাজেই তারাই পারেন এই সমস্যার সমাধান করতে। তাই আজকে আমি এই কথাই বলতে চাই যে, রাজনৈতিক সংস্কৃতির কাজ বাড়ানো দরকার।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা জটিল বলছেন আমি কিন্তু একমত নই। জটিল মোটেই নয়, জটিল করা হচ্ছে। কেমন জটিল করা হচ্ছে? মনিস্বপন দেওয়ান তার দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। কয়েকদিন আগে অন্য একটা অনুষ্ঠানেও উনার সাথে গিয়েছিলাম। উনি করেন কি, সহজ বিষয়টা খুবই জটিল করে ফেলেন। অবশ্য উনার সামনে কথা বলতে ছেয়েছিলাম। উনি অর্থনৈতিক কার্যক্রমের কথা বলছেন। এ নিয়ে এটা বলছেন সেটা বলছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের আরো একটা সর্বনাশ তো ইতিমধ্যে হয়েই গেছে।

আমাদের দেশে মানুষকে রাজনীতি বিমুখ করার জন্য এনজিও কার্যক্রম চলছে। হাজার হাজার এনজিও ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমাদের রাজনীতির কাজগুলোকে ধ্বংস করার জন্যে। সেই বিষয়টা পার্বত্য চট্টগ্রামেও ইতিমধ্যে ঢুকে গেছে এবং এটা যে কত বড় ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে তা বলার নয়। দুঃখজনক হলেও সত্য হচ্ছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা রাজা দেবাশীষ রায় নিজেই একটি এনজিও গঠন করে প্রথমেই এনজিও কাজ উদ্বোধন করেছেন। আমি উনাকে বার বার অনুরোধ করেছিলাম এনজিও পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢুকতে দিবেন না। ক্রেডিট প্রোগ্রাম ঢুকতে দিবেন না। ক্রেডিট প্রোগ্রাম আমাদের সমগ্র জাতিকে ভিক্ষুকে পরিণত করেছে এবং ওখানেও তাই করবে। সেই কাজটাই হতে যাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে।

কাজেই এই বিষয়গুলো যদি স্বচ্ছভাবে ভাবা যায় তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামে সমস্যা সমাধান যে অনেক বেশী জটিল আমার মনে হয় না। প্রশ্ন উঠেছে সেনাবাহিনী নিয়ে। এখন আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো, যে দলই সরকারের ক্ষমতায় যায় না কেন তারা যদি সেনাবাহিনীর প্রতি নতজানু নীতি নেয় তাহলে এ সমস্যার সমাধান কোন কুলকিনারা হবে না। কাজেই একটি গণতান্ত্রিক সরকার যদি সঠিকভাবে সেনাবাহিনীকে চালাতে না পারে তাহলে সেনাবাহিনী কি করবে? পংকজ দা যে কথা বললেন আমি তার সাথে সম্পূর্ণ একমত।

আওয়ামীলীগের আমলে সেনাবাহিনীর একজন ডিরেক্টর আমাদেরকে ফোন করলেন। ঢাকা শহর থেকে অনেক বুদ্ধিজীবী লোককে তারা নিয়ে গিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম ঘোরাবার জন্য। আমি যাইনি। পরবর্তীকালে আমি রাজনীতিকদের জিজ্ঞেস করলাম, মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি জানেন- অনেক শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিকদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? তারা বললেন যে, আমরা তো জানি না। তাহলে এদেরকে কারা নিয়ন্ত্রণ করে? এটা বড় সঙ্গত প্রশ্ন হয়ে দাড়াঁয়।

যাই হোক আমি রাজনীতিবিদদের সমালোচনা করেছি আমার নিজেদেরও সমালোচনা করতে চাই। আমাদের মধ্যে যারা লেখক আছেন বিশেষ করে যারা বুদ্ধিজীবী তারা কোন কাজ করে না। শুধু বিবৃতিতে দস্তখত করেন। আমার মনে হয় তাদেরও কাজ করা দরকার। মুষ্টিমেয় কিছু অধ্যাপক ছাড়া এবং মুষ্টিমেয় কিছু সাংবাদিক ছাড়া আমরা কিন্তু সবাইকে পাই না। এই অবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামে অথবা সমতলের আদিবাসীদের যখন কোন সমস্যা হয় তখন রাজনীতিকদের খুঁজে পাওয়া যায় না। বুদ্ধিজীবীরাও যে তাদের কাজ বাদ দিয়ে দিয়েছেন, ঘরে বসে গেছেন এটাও কিন্তু জাতির জন্য একটা মহা সংকট। বুদ্ধিজীবীরা সবাই দলবদ্ধ হয়ে গেছেন, কেউ এই দলে কেউ ঐ দলে হয়ে গেছেন। তাদের আবেদনও কমে আসছে সেটাও তারা বুঝতে পারেন না। রাজনৈতিক কাজ যেমন বন্ধ হয়ে গেছে তেমন বুদ্ধিজীবীদেরও পারস্পরিক সংলাপ ও সংযোগ যেমন- মানুষের কাছে যাওয়া, গণমানুষের প্রতিনিধি হাওয়ার কাজটা বন্ধ হয়ে গেছে। কাজেই এগুলো বাড়াতে হবে। তাহলেই বোধ হয় শান্তি চুক্তির সমাধান হবে। আমাকে ক্ষমা করবেন রুষ্ট কথা যদি বলে থাকি। আপনাদের ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য।

ফজলে হোসেন বাদশা, পলিটব্যুরো সদস্য, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

শ্রদ্ধেয় সন্তু লারমা, উপস্থিত জাতীয় নেতৃবৃন্দ, সুধীমন্ডলী, সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজকে আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি কি কারণে সেটা আমাদের সবারই জানা। আজকে শান্তিচুক্তি সাত বছর অতিক্রম করলো। যেদিন শান্তিচুক্তি করা হয়েছিল সেদিন যে জায়গায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠী ছিলেন আজকে তার চেয়েও অনেক বেশী ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে আমরা রয়েছি। এটাই হচ্ছে বাস্তবতা অর্থাৎ আমরা পিছিয়ে গিয়েছি। আমরা এগোতে পারিনি।

দুই দশক ধরে এই বিষয়ে আমরা কথা বলছি। দুই দশক ধরে লড়াই চলছে। শান্তিচুক্তির ফলে কেবলমাত্র এই মুহূর্তে একটা অগ্রগতি হয়েছে তা হলো যে সংঘাত এবং রক্তপাত চলছিল আপাততঃ তার মাত্রা কমে এসেছে। এখন হয়ে গেছে একতরফা। যারা আগে আক্রমণ করতো তারা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। যারা প্রতিরোধ করতো তাদের প্রতিরোধটা আপাতত বন্ধ আছে। প্রতিরোধ করার যে প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে তা কয়েকদিন আগে পত্রিকায় দেয়া আমাদের শ্রদ্ধেয় সন্তু লারমার বক্তব্য আমরা পেয়েছি যে, প্রয়োজনে আবার আমরা অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হবো। তাতে বোঝা গেছে তারা পিছুতে পিছুতে তাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। এই বাস্তবতায় আমরা আজকে আলোচনায় বসেছি।

আমার মনে হয় এর মধ্যে একটা ইতিবাচক রাজনৈতিক অগ্রগতি হয়েছে সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো যারা আজকে গণতন্ত্রের জন্য বা অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের জন্য সংগ্রাম করছে তারা স্পষ্টভাবে তাদের কর্মসূচীর মধ্যে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের প্রশ্নটা এনেছেন যে, শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে। এটি একটা ইতিবাচক রাজনৈতিক অগ্রগতি হয়েছে। আমার মনে হয় এই পরিস্থিতিতে আমরা জনসংহতি সমিতির কাছে আবার এই প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করতে পারি যে, আপনাদের সংগ্রামের সাথে আমরা একাত্ম আছি, লড়াই করবো এবং চুক্তি বাস্তবায়নের প্রশ্নে আপনারা যে লড়াই করবেন সেই লড়াই আমাদের লড়াই এভাবেই আমরা বিবেচনা করি এবং এভাবেই আমরা বিবেচনা করবো।

এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের ইস্যুতে রয়েছে একটা মৌলিক বিষয়। এর বাইরেও আরো অনেক বিষয় রয়েছে। তার মধ্যে আমি মনে করি সমতলের আদিবাসীদের বিষয়ও এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ভেবেছিলাম যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি হওয়ার পর সমতলের আদিবাসীর দিকে একটু তাকাতে পারবো। কিন্তু সে তাকানোর সুযোগ আমরা পাইনি এবং এখন বিশেষ করে সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের অবস্থা আগের চেয়ে আরো খারাপ।

মামুন ভাই অনেক সমালোচনা এখানে করেছেন। মামুন ভাইয়ের সমালোচনাগুলোর অনেক যুক্তি রয়েছে। কিন্তু আমি বলবো যে, এটা ঠিক কি কি কারণে যুক্তিযুক্ত? রাজনৈতিক দলগুলো তার করণীয় জায়গায় যেমন- সংখ্যালঘু জাতিসত্ত্বার প্রশ্নে কিংবা অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে কিভাবে চর্চা করবো সে প্রশ্নে একটা দিক নির্দেশনার অভাব রয়েছে। এখানে কোন সুনির্দিষ্ট একটা পথ বা পদ্ধতি বা নিয়ম-কানুন আমাদের মধ্যে নেই। ফলে দেখা গেছে যে, অনেক জায়গায় অনেক সমস্যা হয় সেগুলো রাজনৈতিক বিচারে বিবেচনা করা হয় না।

তার মধ্যে একটা উদাহরণ আজকে আমি দিবো সেটা হচ্ছে আমি গতকাল একটা এলাকার তথ্য পেলাম। ধামুরহাট এলাকায় ধামুরহাট পৌরসভা এলাকা ঘোষণা করা হবে এবং সেই পৌরসভাটা এত বড় করা হচ্ছে তার মধ্যে বড় দুটো আদিবাসী গ্রাম পড়ছে। তারা দিনমজুরী করে। আদিবাসীরা মিছিল করে বলছে আমাদের গ্রাম দুটো বাদ দিয়ে পৌরসভা করা হোক। কারণ দিনমজুর করে যা পাই তাতে পৌর কর দেওয়ার মতো সাধ্য আমাদের নেই। আমরা উৎখাত হয়ে যাবো। ঠিকতো, ঐ আদিবাসী গ্রাম দুটো যে পৌরসভার ভেতর পড়ছে ঐ গ্রাম দুটোই তাদের লক্ষ্য। ঐ গ্রাম দুটো বড় এবং গ্রাম দুটো থেকে যদি আদিবাসীরা উৎখাত হয়ে যায় তাহলে তারা লাভবান হবে।

সেখানে কিন্তু দলমত নির্বিশেষে সবাই ঐক্যবদ্ধ যে, পৌরসভার এলাকা বাড়াতেই হবে এবং আদিবাসীদের গ্রাম দুটো অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। এ ধরনের সমস্যা রয়েছে অহরহ। আমার জেলায় দেখেছি। আমরা আরো অনেক দেখেছি যেমন- আমাদের ঐ এলাকায় টালুর একটা উপজেলা রয়েছে সেখানে থানার সামনে একটা রেষ্টুরেন্ট রয়েছে। সেই রেষ্টুরেন্টে লেখা আছে যে, এই রেষ্টুরেন্টে কোন উপজাতির প্রবেশ নিষেধ। এমন কোন রাজনৈতিক দল নাই এই থানার সামনে দিয়ে যাদের মিছিল চলে না আর যেখানে দাঁড়িয়ে জনসভা হয় না। কিন্তু ঐ রেষ্টুরেন্টে আমরা সবাই খাচ্ছি। কিন্তু আদিবাসীরা বা উপজাতিরা এই রেষ্টুরেন্টে যেতে পারবে না এটা আমাদের দেশের কোন আইন-কানুন-সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে না সে বিষয়ে কথা বলার মত কোন রাজনৈতিক দল বা কর্মী নেই। এই ঘাটতি আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে রয়েছে। এই ঘাটতি পূরণ করার দায়িত্ব নিশ্চয়ই প্রয়োজন।

এখন আমি শুধু একটা প্রসঙ্গে বলবো যে, আজকে এই কথাগুলো কি কারণে আমি মামুন ভাইয়ের সাথে সুরে সুর মিলিয়ে বললাম। এ কারণে যে, আজকে আমাদের সেকুলার দর্শন বা অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংস্কৃতি গ্রহণ করে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মতাদর্শগতভাবে পূর্নগঠিত করা প্রয়োজন। তা না হলে আমরা শান্তিচুক্তি করবো কিন্তু শান্তিচুক্তি বাস্ত বায়ন করতে পারবো না। আমরা শান্তিচুক্তি করবো কিন্তু শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দোদুল্যমান থাকবো। এই বিষয়গুলো আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা আলোচনা করছি যে, এই সরকার কেমন? তা আমরা সবাই জানি এবং এই সরকারের যিনি প্রধান, প্রধানমন্ত্রী তিনি এই শান্তিচুক্তিকে কালোচুক্তি বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি লংমার্চ করেছিলেন। অতএব তার কাছে আমাদের কোন প্রত্যাশা আছে বলে মনে হয় না। অতএব এমন একটা সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিকভাবে জনসংহতি সমিতিকে ভূমিকা পালন করতে হবে যারা চুক্তি বাস্তবাযনের পক্ষে কাজ করবেন। এটা একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তেরও প্রশ্ন। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমি আরেকটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি সেটা হচ্ছে পার্লামেন্টে আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটা কিভাবে মীমাংসা করা যায়? তা না হলে তারা বিচ্ছিন্ন থাকবে। আর বিচ্ছিন্নতার জন্য অন্যরা কথা বলবে তারা নিজেদের জন্য কথা বলতে পারবে না। এই ঘাটতিটা দূর করা দরকার। এখানে নারী আসনের একটা বির্তকিত বিল পাস হয়েছে এবং এটার সঙ্গে আমরা কখনই একমত ছিলাম না। যা হোক নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন হয় কিন্তু আদিবাসীদের জন্য পার্লামেন্টে সংরক্ষিত আসনের প্রশ্নটা কেন আমরা তুলে আনি না। সেটা তুলে আনা দরকার বলে আমি মনে করি। সঙ্গে সঙ্গে আগামীতে যে সমস্ত নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে আদিবাসীদের এবং বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর তাদের প্রতিনিধিত্ব যেন আগামী নির্বাচনগুলোতে নিশ্চিত হতে পারে সে ব্যাপারেও রাজনৈতিক দলগুলোর বিশেষ বিবেচনা রাখার প্রয়োজন রযেছে। কারণ জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব দাবী, নিজস্ব অধিকারের প্রশ্ন শুধু রাজনৈতিক দলগুলো সমর্থন করবেন তা নয়, তাদের দিক থেকেও তার প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারটাকে নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আমি ক'টি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি

সম্মানিত সভাপতি কমরেড সন্তু লারমা, অভিজ্ঞ আলোচকবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বন্ধুগণ। আজ আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির সপ্তম বার্ষিকীতে এই সভায় মিলিত হয়েছি। এই চুক্তি সম্পর্কে স্বাক্ষরকালে আমরা বলেছিলাম যে, এটা একটা ইতিবাচক পদক্ষেপ। আমরা অগ্রগতি সাধন করলাম

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলেছিলাম যে, এটাই যথেষ্ট নয়। আমাদের আরও সামনে অগ্রসর হতে হবে এবং সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ সাংস্কৃতিক, সামাজিক আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বলতে যা বোঝায় তা পরিপূর্ণভাবে অর্জনের জন্য আমাদের লড়াই সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে।

তবে আমরা যেটুকু অর্জন করেছি সাত বছর আগে সেই অর্জনের পেছনে যাদের বুকের রক্ত গেছে, যারা শহীদ হয়েছেন আজকে সকলেরই দায়িত্ব তাদেরকে সম্মানের সঙ্গে, শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা এবং তাহলে পরেই সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আমরা আরো সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারবো। আমাদের অগ্রগতি সম্পর্কে আমি আশাবাদী। কারণ আমি সংগ্রাম সম্পর্কে আশাবাদী। দুই তিন বছর আগে আমরা, তার মধ্যে এখানে কয়েকজন বসে আছি, টেকনাফে ঘুরে আসলাম, তেতুলিয়া ঘুরে আসলাম প্রায় ৯০০ কিলোমিটারের উপরেই হবে (পরে আমরা হিসাব করে দেখলাম ১০০৪ কিলোমিটার হবে) এবং আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি ১১ই ডিসেম্বরে গণঅনাস্থা প্রাচীরের।

এই গণঅনাস্থা কেবলমাত্র সরকারের পতনের জন্য নয়, আরো মূল কতগুলো দাবী এখানে অন্তর্ভূক্ত করেছি। মুল দাবী বাছাই করতে গিয়ে আমাদের ১০০টা দাবী পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়নি। ৯টি মূল দাবীর ভেতরেই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবী হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবী আমরা অন্ত র্ভুক্ত করেছি। মামুনুর রশীদ অনেক সত্য কথাই বলেছেন, তবে হয়ত উনি যদি আমাদের সাথে থাকতেন তাহলে এই অভিযোগ উনি করতেন না যে, রাজনীতিবিদরা পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেননি। আমরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলে এসেছি এবং বলতে থাকবো, আমাদের অব্যাহত প্রচেষ্টা থাকবে।

মামুনুর রশীদ যেটা বলেছেন সেটা কেবলমাত্র একটা রাজনৈতিক বীড়বফরবহঃ বলা যেতে পারে। সাময়িক সুবিধার জন্য কায়দা করতে হবে; ভোটের জন্য এইদিকে যেতে হবে, ঐদিকে যেতে হবে। সেই কারণে সমস্যাটার উৎপত্তি। সেটা একটা কারণ বটে। কিন্তু এর পেছনে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক দর্শনের মূল ভাবনা যুক্ত রয়েছে। সেইখান থেকেই এর গোড়া পত্তন।

আপনাদেরকে একটা উদাহরণ দিই। সেদিন ঢাকায় একটি সেমিনার হলো। সেখানে ঢাকায় উন্নয়নের জন্য চারশ' কোটি টাকার প্রজেক্ট হচ্ছে। বড় বড় বাড়ী করতে হবে, সুন্দর সুন্দর এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে। শেষে একজন বক্তা বললো- না, এগুলো খুবই ভাল আলোচনা, তবে আমাদের এখানকার যে বস্তিবাসী আছে তাদের কথাটাও কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত। একটু ভাল করে ভেবে দেখুন, এমন একটা সেমিনার কি আমরা কল্পনা করতে পারি বা পারি না? যেখানে ঢাকা শহরের অধিকাংশ মানুষ যারা গরীব এবং বস্তিবাসী তারা আলোচনা করতে বললে বলবে, বস্তিতে আমাদের ইলেক্ট্রিসিটি দরকার, অমুক দরকার, সমুক দরকার। তারপর একজন গিয়ে বলবে যে, হ্যাঁ এখানকার কোটিপতিদের জন্য আমাদের কিছু কিছু ব্যবস্থা রাখা উচিত। সম্ভবতঃ এই চিন্তার জায়গায় উল্টো জায়গাতে চলে যাচ্ছি এবং আমরা বাঙালীরা বলছি যে, বাঙালীদের এই উন্নতি করতে হবে।

পার্বত্য শান্তি চুক্তি যেদিন হলো সেদিন টেলিভিশনের টকশো'তে আমি ছিলাম এবং সেখানে একজনের সাথে আমার একটু সমালোচনাটা বলতে হলো। তিনি বললেন, অন্য সরকার পার্বত্য এলাকার লোকদের যা দেয় নাই এই সরকার সবচেয়ে বেশী দিচ্ছে। আমি তখন বলতে বাধ্য হলাম, আমরা বাঙালীরা তাদের দেওয়ার কে? বরং এটাতো হতে পারে যে, পার্বত্য এলাকার লোকেরা আমাদের বাঙালীদেরকে কতটুকু অধিকার দিলো? কনসেপ্টটা এমন যে, আমরা হলাম প্রধান, তারা হলো অবশিষ্টাংশ। আমরা এটা ভাবতে পারছি না যে, এটা হলো আমাদের সববেত অংশগ্রহণের ব্যাপার। বরঞ্চ আমরা বলতে পারি, পার্বত্য এলাকার মানুষরা আমাদের সেন্ট্রাল রাষ্ট্রকে কতটুকু ক্ষমতা এবং অধিকার অর্পণ করলো? সুতরাং আমাদের একেবারে কমপ্লিটলি উল্টো জায়গা থেকে ভাবতে হবে।

আরেকটি উদাহরণ আমি লোভ সামলাতে পারছি না। প্রপার্টি রাইট্স সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে। প্রাইভেট প্রপার্টি, ল্যান্ড এবং এর জটিলতা বিষয়ে এখানে বলা হয়েছে। গত পরশু একটা সেমিনারে ছিলাম। ল্যান্ড ডিক্রিকেশন সম্পর্কে আবুল বারাকাত উত্থাপন করলেন সেখানে তিনি রুশোর একটা কোটেশন উদ্ধৃতি দিলেন। আপনারা সবাই রুশোর নাম জানেন। বিখ্যাত দার্শনিক তিনি। একটি কোটেশনে রুশো বলছে- সমাজের অগ্রগতির মুহূর্তে যখন একটা মানুষ লাঠির উপরে লাল ঝান্ডা, লাল নিশান ধরে মাটিতে গেড়ে প্রথম বললো যে, এইটা আমার। তখন থেকেই সভ্যতা ধ্বংস হয়েছিল! যখন প্রাইভেট প্রপার্টি, জমি আমার- এই কথাটা বলে প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল তখন সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেল।

আমরা পার্বত্য এলাকায় জুমচাষ পদ্ধতিতে প্রাইভেট প্রপার্টির ধারণাটা তাদের মাথায় নাই। প্রাইভেট প্রপার্টি কেন আসবে? যৌথ প্রয়াসের ভেতর দিয়ে আমরা সম্পদ তৈরী করছি। সুতরাং এটার মালিকানাটাও হবে যৌথতার ভিত্তিতে। সুতরাং অনেক সময় আপনাদের আমি বলি, পার্বত্য এলাকায় লোকেরা সভ্যতার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। আমার একটু জানতে ইচ্ছে করে- সম্ভবত আমরা যারা নাকি প্রাইভেট প্রপার্টি ভিত্তিক তথাকথিত সভ্য সমাজ গড়ে তুলে, একটা বৈষয়িক সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলে একটা যান্ত্রিক সভ্যতার নাম করে আমরা যে বিরাট গর্ব করি, সম্ভবতঃ আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত অবস্থায় তারা চলে গেছে।

সুতরাং রুশোর কোটেশনটাই যখন হবে আমরা বাঁশের উপরে লাল নিশান টাঙ্গিয়ে মাটিতে গেড়ে আমরা বলতে পারবো যে, এই সম্পদটি আমার না, এটা আমাদের। এই সামাজিক ভিত্তির উপরে, কমিউনিষ্ট সভ্যতার উপরে, সমাজতন্ত্রের সভ্যতার উপরে যখন নতুন ভিত্তি রচিত হবে তখন সভ্যতার আরেকটি নতুন পর্বে আমরা প্রবেশ করতে পারবো।

আমি আরেকটি পয়েন্ট বলতে চাই- লিখিত প্রবন্ধের সাথে আমি একমত। এখানে বলা হয়েছে- বার বার চুক্তি হয়, বাস্তবায়ন হয় না, একই ঘটনা ঘটে চলেছে। সেনাশাসন, সেনাবাহিনী, মুসলিম সম্প্রসারণবাদ, উগ্র বাঙালী জাত্যাভিমান এবং এর ধারক-বাহক গভর্ণমেন্টের কথা, সেনা হস্তক্ষেপের কথা পংকজদা আপনাদের সামনে বললেন। ১৯০০ সাল থেকে বিশেষ আইনের অধীনে পার্বত্য এলাকা শাসন করা হতো সেটা আমাদের জানা আছে।

এটার সাথে আমি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই বলছি, সবাই এই বিষয়টা ভাববেন, তা না হলে আগামী দিনের ঘটনাপ্রবাহ বুঝতে পারবেন না তা হলো আমাদের পুরো বাংলাদেশ, বিশেষ করে পার্বত্য এলাকা এখন সাম্রাজ্যবাদীদের স্ট্রাটেজীর অংশ হয়ে দেখা দিয়েছে। আমেরিকার পিটারসন সাহেব এসে ঘুরে গেলেন; তিনি বললেন, বাংলাদেশের ভবিষ্যত খুবই উজ্জ্বল। কেননা এটা চীনের খুব কাছাকাছি, ভারতের সংলগ্ন, মায়ানমার সঙ্গে সংযুক্ত। তাই এই ভৌগলিক অবস্থা যদি ঠিকমত কাজে লাগাতে পারে অর্থাৎ আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করে তাহলে বাংলাদেশের ভবিষ্যত মহাউজ্জ্বল। তারা এখানে ঘাটি বানাতে চায়, পার্বত্য এলাকায় তারা হাত বাড়াতে চায় যাতে ভারতকে চাপে রাখতে পারে। ভারত যাতে আমেরিকার পক্ষনীতি গ্রহণ করে। এর জন্য উত্তর-পূর্ব ভারতের ইনসারজেন্সীদের লালন করার কতগুলো পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়। আমি আর বিস্তারিত পয়েন্টে যাচ্ছি না।

আপনারা ভেবে দেখবেন এবং খুবই সতর্ক থাকবেন যে, সমগ্র বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী স্ট্রাটেজী হয়ে গেছে। এখন বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে আমেরিকার যে মূল টার্গেট তা হলো আমাদেরকে আবদ্ধ করার প্রয়াস। এর অন্যতম রণক্ষেত্র হবে পার্বত্য এলাকা। সেই জায়গা থেকে অনেক কলকাঠি নাড়া ইত্যাদি জিনিসগুলো করার কাজ করবে। এই প্রসঙ্গে আরো বলতে চাই- এই লড়াই আমাদের সকলের লড়াই। এটা শুধু সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর লড়াই নয়, সমস্ত বাংলাদেশের নাগরিকের লড়াই। কারণ এই রাষ্ট্র

খালি বাঙালীর রাষ্ট্র এটা আমি প্রথমেই স্বীকার করি না। সুতরাং আমাদের বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় স্বার্থের জন্য যে লড়াই সেই লড়াইয়ের অন্যতম একটা প্রধান অঙ্গ হচ্ছে এখানকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলো যারা আছে তাদের পরিপূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার। সেই পরিপ্রেক্ষিতে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়টা আমাদের দেখতে হবে। কেন আওয়ামীলীগের আমলে বাস্তবায়িত হলো না এটা ভেবে দেখতে হবে সবাইকে।

অনেক সময় এরকম মনে হয়, আমি এত বড় কাজ করে দিলাম তাহলে পরে আমার দলীয় প্রভাব একটু যদি না হয়? অর্থাৎ আওয়ামীলীগের লোকদের ঐখান থেকে এমপি হওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। কিংবা সন্তু লারমা যদি আওয়ামীলীগে যোদদান করতেন তাহলে চুক্তি ভালভাবে বাস্ত বায়ন করতাম। এই রকম কতগুলো দলীয় সুবিধার চিন্তা অনেক সময় প্রধান হয়ে উঠে কিনা তা গুরুত্ব কিংবা মনোযোগ দিয়ে দেখা প্রয়োজন।

৭২-এ সংবিধান রচনা করা হয়। সেই সময়েই এই ত্রুটিটা লক্ষ্য করা গেছে। আমাদের সিপিবি তখন এত ভালো সংবিধান বিষয়ে বিরোধিতা করেছিলাম। একটা হলো জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি নাই, আরেকটি হলো নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন। আমার মনে আছে, আমরা মিছিল করে পার্লামেন্টে প্রতিবাদ করে সংশোধনী প্রস্তাব লিখিতভাবে দিয়েছিলাম। কিন্তু সেখান থেকে বের হয়ে ক্রমে নতুন একটা অবস্থায় আমাদের যেতে হয়। তাই এটা সকলের লড়াই, সমবেত লড়াই। বাংলাদেশের শোষিত মানুষ, শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষ, তাদের আন্দোলনের বিকাশের সঙ্গে জাতিসত্তার অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠার আন্দোলন একত্রিত না করতে পারলে আমরা কিন্তু মহাসমরে জয়লাভ করতে পারবো না।

আমার সর্বশেষ পয়েন্ট, লিখিত প্রবন্ধের সামান্য দ্বিমত আমি পোষণ করি। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হলে কেবলমাত্র অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সরকার হলে পরে এর শর্ত পূরণ হয় এটা আমি পুরোপুরি মেনে নিতে পারছি না। আমি বলতে চাই, একটা অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল সরকার, বামপন্থী গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল সরকার এই চরিত্রটার পূর্ণাঙ্গতা যদি রাষ্ট্র এবং সরকারের না হয় সম্ভবত আমরা এই শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন করতে পারবো না। সেই শক্তি বিকাশের জন্য আমরা অগ্রসর হচ্ছি। অগ্রসর হওয়ার জন্য আমাদের মানবপ্রাচীরের কথা বলছি।

অবশ্য বলা হয়েছে ১৪ দলীয় জোট বলে কোন কিছু বলা হয়নি, ১৪ দলের কোন মোর্চা গঠিত হয়নি। এখানে ১১ দল তার স্বতন্ত্র অবস্থান নিয়ে আছে। ১১ দল আছে, আওয়ামীলীগ আছে, জাসদ আছে, ন্যাপ আছে। আমাদের যুগপৎ লড়াই হচ্ছে। একমঞ্চও হয় নাই। ১৪ দলীয় জোটও গঠিত হয় নাই। আমাদের এই অবস্থান থেকেই এই লড়াই চলছে। এটা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, কতগুলো কমন ইস্যুতে আমরা লড়াই করছি এবং সেই লড়াই যত বিকশিত হবে ততই আমাদের প্রগতির ধারায় এদেশকে পরিবর্তন করে নিয়ে আসা আমাদের আরও সহজতর হবে। আপনাদের সবাইকে মনোযোগের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। লাল সালাম।

তোফায়েল আহমদ, এমপি, প্রেসিডিয়াম সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ

মাননীয় সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সম্মানিত সভাপতি, আমাদের সকলেরই প্রিয় একজন সংগ্রামী নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, আমরা যাকে সন্তু লারমা হিসেবে শ্রদ্ধা করি, সম্মানিত আলোচকবৃন্দ, সুধীমন্ডলী, ভাই ও বোনেরা। আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি যে, আপনাদের এখানে এসে দু'একটি কথা বলার সুযোগ লাভ করে।

আমি গভীর মনোযোগ সহকারে সকলের বক্তব্য শুনেছি, আমার খুব ভালো লেগেছে। ১৯৯৭ সালের এই দিনে আমরা ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি করেছিলাম। দীর্ঘদিনের হানাহানি, ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে আমরা একটি চুক্তিতে উপনীত হয়েছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম যে, বাংলাদেশের সুন্দর একটি জায়গা, প্রাকৃতিক দৃশ্যে যেটা সবচেয়ে বেশী সমৃদ্ধ; যেখানে গেলে মনে হয় আমরা সুইজারল্যান্ডে এসেছি, যেখানে গেলে মনে হয় পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশের ছবি, সে ছবি মানুষের মানসেপটে হৃদয়ে ভেসে উঠে, সেই পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপিত হবে সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে আমরা এই চুক্তিতে উপনীত হয়েছিলাম।

আজকে ৭ম বার্ষিকীতে এসে আমরা সকলেই আলোচনা করলাম চুক্তি বাস্তবায়ন হয় নাই। আবার সেই পার্বত্য চট্টগ্রামে হানাহানি, খুনোখুনি। সন্তু লারমার লেখা আমি বসে বসে পড়লাম যে, একটা চরম অশান্তি পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজ করছে। এটা শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামে নয়, সারা বাংলাদেশেই আজকে অশান্তি। সারা বাংলাদেশ আজকে জ্বলছে। আমরা যারা এখানে ছোট বড় সমবয়সী এখানে মিলিত হয়েছি, আমরা একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এই বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিলাম। স্বাধীন বাংলাদেশে যারাই বসবাস করে সকলেরই একই অধিকার আমাদের সংবিধানে স্বীকৃত হয়েছে। সেই বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে আজকে আমাদের অনেকের মনে প্রশ্ন- আমরা কি এই বাংলাদেশ চেয়েছিলাম?

নভেম্বর মাসে সাড়ে তিনশত লোককে জীবন দিতে হয়েছে। আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনা শান্তিচুক্তি করার পরে ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। আমি যখন বানিজ্য মন্ত্রী হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সফর করেছি, আমাদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, একদিন পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী হাতিয়ার তুলে নিয়েছিল আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য। তারা এখন অস্ত্রসমর্পণ করলো এটা কিভাবে সম্ভব হলো? আমরা সকলেই সেদিন মিলিতভাবে খাগড়াছড়ি ছিলাম। একটা শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলাম।

এটাও সত্য, আমরা যখন শান্তিচুক্তি করছি আজকের দিনের প্রধানমন্ত্রী তিনি রোডমার্চ করেন এবং পার্লামেন্টে বলেছিলেন- যদি পার্বত্য চট্টগ্রামে চুক্তি হয়, ফেনীসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের অংশ হয়ে যাবে, আজকে তারাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়। অনেক সমস্যা বেড়েছে। আমরা মনে করি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, প্রিয় মামুন সাহেব কিছু কথা বলেছেন, আমরা যারা রাজনীতি করি আমাদের প্রতি মানুষের অনেক আশা, বিশ্বাস। যারা রাজনীতি করে তাদের দায়িত্ব অপরিসীম। আমরা সরকারে ছিলাম পাঁচ বছর। দীর্ঘদিন পরে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করেছিলাম।

স্বাধীনতার পরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর পলিটিকেল সেক্রেটারী হিসেবে, পরবর্তীতে উনি যখন রাষ্ট্রপতি হন তখন বিশেষ সহকারী হিসেবে বঙ্গবন্ধুর পাশে থাকার সুযোগ হয়েছিল। আমরা একটা চরম অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে স্বাধীনতার পরে সরকার পরিচালনা করে যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছিলাম তখনই কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়। আমাদের প্রিয় বন্ধু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা যার সঙ্গে জাতীয় সংসদে আমিও সদস্য ছিলাম, আমরা এক সাথে কাজ করেছি, কথা বলেছি, চমৎকার মনের একজন মানুষ ছিলেন যিনি অন্তর দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষকে ভালোবাসতেন এবং তিনি চেয়েছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিটি মানুষ সুখে থাকুক, শান্তিতে থাকুক। তিনি আজকে নেই, আমি তাঁকেও আজকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি।

৭৫-এর ১৫ আগষ্টের পরেই আপনারা লক্ষ্য করবেন- স্বাধীনতার পরে যারা বাঙালী ওখানকার স্বায়ী বাসিন্দা না কিছু কিছু গেলেও কিন্তু সুপরিকল্পিতভাবে ৭৫-এর পরেই অন্য জায়গা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করে। আমি যখন মিনিস্টার, রাজ্জাকভাই, শ্রদ্ধেয় মন্নান সাহেবসহ লংগদু নামক

একটা জায়গায় যেখানে ২৮ জন লোককে হত্যা করা হয়েছিল আমি সেখানে গিয়েছিলাম। সেখানে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। আমরা সেনাক্যাম্প থেকে স্পীড বোটে সেখানে গেলাম তখন একদিকে হত্যাযজ্ঞ অপরদিকে দেখলাম কী সুন্দর পার্বত্য চট্টগ্রাম, যে পার্বত্য চট্টগ্রাম আজকে প্রতিদিন খবরের কাগজে দেখি ওখান থেকে অস্ত্র উদ্ধার হচ্ছে। কোথা থেকে আসতেছে? হয়তো দেখা যাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে যারা আছে তারা জড়িত না।

এখানে একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি রেখে আমরা পালাক্রমে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করার প্রক্রিয়া পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলাম। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ক্যান্টনমেন্ট আছে। সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামে থাকতে পারে কিন্তু এই অবস্থায় না। আমাদের পরিকল্পনা ছিল যে, 'অপারেশন উত্তরণ' যেটার ব্যাপারে আপনারা আপত্তি জানিয়েছেন, অপারেশন উত্তরণের লক্ষ্য ছিল আইন-শৃঙ্খলার অবনতি যাতে না হয়। পর্যায়ক্রমে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা আমাদের পরিকল্পনায় ছিল। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সেনাবাহিনী এভাবে গভীর অরণ্যে আসলে তারাও থাকতে চান তা নয়। কিন্তু এটা সরকারের সিদ্ধান্ত তারা সেখানে আছে।

আজকে আরেকটি সংগঠন দিয়ে সেখানে একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা এগুলো চিন্তা করেই আমাদের ৯ দফা ভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ নূন্যতম কর্মসূচী দিয়েছি। আওয়ামীলীগ, ১১ দল, জাসদ (ইনু), ন্যাপ তার মধ্যে। পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের কথা এবং পরবর্তীতে আদিবাসীদের কথাও আমরা সেখানে সন্নিবেশিত করেছি।

একদিকে যেমন পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা অপরদিকে সারা বাংলাদেশের সমস্যা। বাংলাদেশে এখন একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। যারা স্বাধীনতা যুদ্ধের পরাজিত শক্তি আজকে তারা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করেছে। অনেকে বলেছেন, যারা আমার মাকে ছেলেহারা করেছে, বাপকে পুত্রহারা করেছে, বোনকে স্বামীহারা করেছে আজকে তাদের বাড়ীতে পতাকা পটপট করে উড়ে। আর আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম, হাতিয়ার তুলে নিয়ে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম, আমাদেরকে হাতকড়া পরিয়ে কারাগারে নিয়ে যায়। একই সময়ে স্বাধীনতা বিরোধী মন্ত্রী তার গাড়িতে পতাকা উড়ে।

আমরা যারা রাজনীতি করি, আসলে রাজনীতির পরিবেশটাই নষ্ট হয়ে গেছে। রাশেদ খান মেনন, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, পংকজদা আমাদের সিনিয়র, আমরা সকলেই ছাত্র রাজনীতির মধ্য দিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করি। সেদিনের যে পরিবেশ; জিয়াউর রহমান বলেছিলেন- ও সধশব ঢ়ড়ষরঃরপং ফরভভরপঁষঃ ভড়ৎ ঃযব ঢ়ড়ষরঃরপরধহ- এটা অন্ততঃ সঠিকভাবে সার্থকভাবে সফল হয়েছে। চিন্তা করে দেখেন আমরা কোনদিন '৭৫-এর আগে (মাফ করবেন) একজন রাজনীতিবিদ ছাড়া একজন এমপি হওয়ার কল্পনা করতাম না এবং রাজনীতিবিদদের রাজনীতি এটাই ছিল স্বাভাবিক। পাকিস্তান আমলেও আমরা তাই দেখেছি। ৭৫-এর পরে একজন আমলা, অবসরপ্রাপ্ত একজন সচিব তিনি এমপি হয়ে গেলেন, মন্ত্রী হয়ে গেলেন, একজন ব্যবসায়ী তিনি টাকা দিয়ে এমপি হয়ে গেলেন, মন্ত্রী হলেন; একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা, তিনিও সেই রাজনীতিতে প্রবেশ করে বড় হয়ে গেলেন। আর যারা পরীক্ষিত রাজনীতিবিদ নেতা তাদের জন্য কঠিন হয়ে গেছে। আজকে যারা ক্ষমতায় তারা ক্ষমতার রাজনীতি করে, ক্ষমতায় কিভাবে যাওয়া যায়।

প্রশাসনকে তছনছ করে দেয়া হয়েছে, বিচার বিভাগকে তছনছ করে দেয়া হয়েছে। আমি চুক্তির ৭মবর্ষপূর্তিতে যারা চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলতে চাচ্ছি- আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। হ্যাঁ আমরা তিনবছর আটমাসে কতগুলো জিনিস করে যেতে পারি নাই। আমাদের ইচ্ছা ছিল। আমরা কতগুলো কাজ করেছি। এখন যারা ক্ষমতায় আছে তারা ছিল এই চুক্তিটার বিরোধী।

আমরা আপনাদের বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করি, আগামী দিনগুলোতে যাতে ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত হয় চুক্তির ৭ম বার্ষিকীতে সেই অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি।

রাজেকুজ্জামান রতন, বর্ধিত সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল

সভাপতি, সম্মানিত সুধীমন্ডলী। যদিও এখানে কথা বলা আমার জন্য খুবই বিব্রতকর; আমার অবস্থান, বয়স বিবেচনা করে তারপরও যখন বলেছেন, সংক্ষেপে কতগুলো কথা বলবো। ১৯৭১ সালে ডিসেম্বর মাসে আমরা বিজয় অর্জন করেছিলাম। কিন্তু বিজয় অর্জনের পর থেকে আমরা সব হারাতে চলেছি। গত ৩২ বছরে আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি। আবার ঠিক একই ডিসেম্বর মাসের ২ তারিখে রক্তক্ষয়ী ২৭ বছরের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটা চুক্তি হয়েছিল। কেউ কেউ বলছেন এটা আপাতঃ বিজয়। কিন্তু চুক্তি করার পর থেকে মনে হয় আমরা সব হারাতে চলেছি। যেমন তিনটা প্রধান বিষয় ছিল এগুলো বাস্তবায়িত না হলে চুক্তি আসলে বাস্তবায়িত হবেই না।

একজন মন্ত্রী হলেই কি চুক্তি বাস্তবায়িত হয়? কথা ছিল সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার করতে হবে। ৫৩১টি সেনাক্যাম্পের মধ্যে মাত্র ৩১ টি সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। বাকীগুলো হয়নি। বলা হয়েছিল পার্বত্য জনগণের ভূমির অধিকার দিতে হবে। ভূমি কমিশন গঠন করে ৩ বছর পর্যন্ত চেয়ারম্যানও নিয়োগ দেয়া হয়নি। তাহলে ভূমি অধিকার কিভাবে বাস্তবায়িত হবে। তারপর ভোটাধিকার। পার্বত্যবাসীর যে ভোটাধিকার এটা কিসের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবে? এখন পর্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলে ভোটাধিকার পাবেন কারা সেটাও কিন্তু সুনির্দিষ্ট হয়নি। ফলে এই তিনটা বিষয় যেহেতু ংবঃঃষব হয়নি, ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি আসবে না।

আমরা আসলে শান্তিচুক্তি বলি না, বলি পার্বত্য চুক্তি হয়েছে; কিন্তু শান্তি এখনও সুদূর পরাহত। আমাদের কিছু বক্তব্যের ধরণ দেখেন আপনারা, পত্রিকায়ও লিখি- আমরা যা পড়ি- বলছে যে, পাহাড়ী সন্ত্রাসী গ্রেফতার করা হয়েছে। অস্ত্র হাতে যারা ধরা পড়ে বাঙালীদেরকে কখনো কি লেখা হয় বাঙালী সন্ত্রাসী ধরা পড়েছে? অস্ত্র কি শুধু নাইক্ষ্যংছড়িতে পাওয়া যায়? অস্ত্র বগুড়াতে পাওয়া যায়নি? চট্টগ্রামে ১০ ট্রাক অস্ত্র ধরা পড়েনি? কিন্তু প্রবনতা এমন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম হচ্ছে অশান্তির আখড়া।

ক্লাস এইটের সমাজবিজ্ঞান বইয়ে আপনারা দেখবেন, মানুষ সন্ত্রাসী হয় এবং অপরাধপ্রবন হয় কেমন করে? একটা পয়েন্ট সেখানে বলা হয়েছে- সাধারণতঃ সমতল ভূমির তুলনায় পাহাড়ী অঞ্চলের জনগণ একটু সন্ত্রাসী প্রবনতাসম্পন্ন হয়। এটা ছেলে শিখছে। তাহলে দেখেন প্রবনতাটা এমন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিচ্ছিন্ন করে দেখছি। একদিকে সাংস্কৃতিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে এবং প্রশাসনিকভাবে সমস্ত দিক থেকে তাদেরকে আমরা চাপের মধ্যে রেখে বলছি- আস শান্তি করি। তাহলে কি আমরা এত গণতন্ত্রের কথা বলি; আমাদের এই পাহাড়ী জনগণের দুঃখের কথা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার দুঃখের কথা আমাদের রাজনৈতিক শ্লোগানে, কর্মসূচীতে কি আছে?

আমরা আমাদের দলের পক্ষ থেকে 'পার্বত্য চুক্তি প্রসঙ্গে' নামে একটা বই বের করে হাজার হাজার কপি বিলি করেছিলাম। অনেকে আমাদের অবিশ্বাস করেছে। আসলে কি চুক্তিতে এ সমস্ত কথা লেখা আছে? কারণ সরকার চুক্তি করেছেন তারাও কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই চুক্তিতে কী বলা হয়েছে জনগণকে জানাবার জন্য। আমরা গণতন্ত্রের কথা বলি কিন্তু জনগণকে অন্ধকারে রেখে চুক্তি সম্পাদন করি। ফলে এটাও জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ তৈরী করার জন্য উপাদান হিসেবে কাজ করে।

আমার মনে হয়, এই আলোচনা সভায় দু'টা দিক থাকা উচিত। একটা হচ্ছে যে, ৭ বছরে আমাদের যা আশা ছিল তা পূরণ হয়নি, সেই ব্যর্থতা আমাদের আছে, ব্যর্থতার কষ্ট আছে, গ্লানি আছে, সেটা যেমন আছে, সাথে সাথে একটা দায়িত্বও আছে।

একটা জনগোষ্ঠীকে অন্ধকারে রেখে, বঞ্চিত রেখে দেশটাকে গণতন্ত্রের পথে পরিচালিত করা যায় না- এই বোধটা যেন আমাদের সকলের মাঝে আসে। আমরা যেন সমতল, পাহাড়ি সমস্ত অঞ্চলে আমরা নিপীড়িত মানুষের পক্ষে দাঁড়াতে পারি, সেই জন্য আমরা যেন সবাই কাজ করি। এই সভায় আমাকে কিছু বলার সুযোগ দানের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

রাশেদ খান মেনন, সভাপতি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

সম্মানিত সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, সম্মানিত আলোচকবৃন্দ এবং আলোচনায় অংশগ্রহণকারী পাহাড়ী-বাঙালী ভাই ও বোনেরা।

আমার সন্তু লারমার সঙ্গে দিনগুলো মনে পড়ছিল, যখন আমরা দুদুকছড়ির জঙ্গলে বসে চেষ্টা করছিলাম একটা শান্তি চুক্তিতে আসার জন্য। তার আরও আগে আমার মনে আছে, ১৯৮০ সালে কাউখালীর হত্যাকান্ডে তখন আমি ৩য় পার্লামেন্টে সদস্য, তরুন সাংসদ। কাউখালী গণহত্যার পরপরই সেটা প্রত্যক্ষ করার জন্য দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে গিয়ে আমার প্রথম যে অনুভূতি হয়েছিল সেটা হচ্ছে, ৭১-এর সমমানের গণহত্যা এখানে সংঘটিত হলো আমার বাংলাদেশে। ফিরে এসে আমরা চেষ্টা করেছিলাম পার্লামেন্টে বিষয়টি উত্থাপন করতে; আমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়নি। এই সমস্ত ঘটনার যারা হোতা সেই সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে পার্লামেন্টের তরফ থেকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল পার্লামেন্টে একটা তথাকথিত কমিটির নাম করে।

সেই সময় থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন সমস্যা-সংকটের ব্যাপার নিয়ে, রাজনৈতিক সংকটের ব্যাপার নিয়ে দলের তরফ থেকে সেই সময় যারা আমরা এক সাথে কাজ করেছি তাদের তরফ থেকে আমরা চেষ্টা করেছি এই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। মামুনুর রশীদ অভিযোগ করেছেন, রাজনীতিবিদরা কী করেছেন? সেই সময়ে আমাদের এই খোঁজগুলো রাখলে তারা বুঝতে পারতেন যে, আমাদের চেষ্টা তো কম ছিল না। হয়তো পরিমাণগতভাবে খুব বেশী না। যার কারণে তা দৃশ্যমান বেশী হয়নি।

৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের পরবর্তীকালে আমরা দুদুকছড়ি অরণ্যে শান্তি প্রক্রিয়ার বিষয়টি নিয়ে চেষ্টা করছিলাম। ৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের পরবর্তীতে যে পার্লামেন্ট গঠন হয় সেই পার্লামেন্টেই প্রথম আমরা বিষয়টি রাজনৈতিক সমাধানের জন্য একটি জাতীয় কমিটি গঠন করি এবং আমার সৌভাগ্য যে, সেই জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে শান্তি প্রক্রিয়ার আলোচনায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়েছিল। সেদিন সন্তু লারমা একটি বড় ধরনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। শান্তি অর্জনের জন্য সে অনেক বড় ঝুঁকি। একটা সংঘাতের স্থানে যুক্ত একটা জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, তা বাস্তাবায়নের ক্ষেত্রে একটি শান্তি চুক্তির মধ্যে চলে আসা- এর মধ্যে বিশাল ধরনের রাজনৈতিক দূরদর্শিতাসম্পন্ন এবং সেখানে ঝুঁকি নেয়ার সাহস সেই বিষয়টি থাকে। সেটা উপলব্ধির মধ্যে আসা প্রয়োজন।

যখন আমরা সমালোচনা করি এর মধ্যে অপূর্ণতা আছে তখন। কিন্তু আমরা এই বিষয়গুলোকে হিসেবের মধ্যে নিই না। আমরা সেদিনই ১১ দলের পক্ষ থেকে বলেছি, বিবৃতি দিয়ে বলেছিলাম, পার্বত্য চুক্তি হচ্ছে সমস্যা সমাধানের প্রাথমিক পদক্ষেপ। এটিই সম্পূর্ণ নয়। আমি বলতে চাই সমাধানের একটা সুত্রপাত হয়েছে। সেটা থেকে আমরা পিছাইয়েছি কিনা? আমি বলতে চাই আমরা পিছাইনি। বরং শান্তিচুক্তির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে পার্বত্য জনগোষ্ঠীর লড়াইয়ে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছি। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জনসংহতি সমিতির সদস্য যারা লড়াইয়ে ছিলেন সেদিনও আমি তাদের বলেছি- আপনাদেরকে দেশের ভিতরে তাকাতে হবে। আমাদের নিজেদের বলেছি- আমরা যেন আপনাদের দিকে তাকাই এবং যেন

দু'জনের মেইলবন্ধন ঘটে। সেই জায়গায় মিলেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি ইস্যু হিসেবে সামনে আসে তাহলেই সমস্যার সমাধান আমরা যুক্তভাবে করতে পারবো।

সন্তু লারমার বক্তব্যে এসেছে, সকল গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল শক্তির সম্মিলিত প্রয়াস, এটাকে রাজনৈতিক আন্দোলনের মূলধারার সাথে যুক্ত করে সামনে নিয়ে আসতে পারলেই এই সমস্যার সমাধান হবে- এটা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আমিও মনে করি যে, বড় ধরনের অগ্রগতি হয়েছে পার্বত্যবাসীর মধ্যে। যে আশাহত বেদনা রয়েছে, সেটা উপলব্ধি করেই প্রতিদিন প্রতিমূহূর্তে পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন করে সংঘাত সৃষ্টি করার জন্য ষড়যন্ত্র চক্রান্ত চলছে। যা ছিল সেই অবস্থাটা অনেকটা বহাল তবিয়তে আছে। তার থেকে যদি হতাশার জন্ম হয় তাহলে আমাদের আশ্চর্যের কিছু থাকবে না। তারপরও বলবো যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তার আন্দোলনে চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে সে অঞ্চলের জনগণকে সংগঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। সন্তু লারমা যখন দাঁড়িয়ে বলেন যে, প্রয়োজনে আমাদেরকে আবার লড়াইয়ের পূর্ব জায়গায় চলে যেতে হবে তখন কিন্তু তিনি অনেক বেশী আস্থা নিয়ে কথা বলেন বলে আমার বিশ্বাস। আমার মনে হয়েছে তাঁর সমস্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এই আস্থাটা বেরিয়ে আসে।

মূল জায়গাটা হচ্ছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যা। আমরা আমাদের সংবিধান রচনার সময় জাতীয় সংখ্যালঘুদের স্বীকৃতি দিই নাই, দিতে পারি নাই। এই ব্যর্থতা থেকেই সমস্যার উৎপত্তি। এই মানসিকতা এই দৃষ্টিভঙ্গি এখনও বহাল আছে বলে আমার নিজের কাছে মনে হয়। আজকে তোফায়েল আহমেদ আছেন। আপনি যদি ৯১-এর পার্লামেন্টের আলোচনাগুলো যদি খেয়াল করেন, দেখবেন আপনার নিজের দল বা অন্য দলগুলো বলেন, এই দৃষ্টিভঙ্গি তাদের আলাপের মধ্যে বেরিয়ে এসেছে বিভিন্ন সময়। সবসময় এটাকে বাঙালী-পাহাড়ীর দ্বন্দ্ব বলা হয়। এটা বাঙালী-পাহাড়ীর মোটেও দ্বন্দ্ব ছিল না। এটা সম্পূর্ণভাবে অধিকারের প্রশ্ন, জাতিসত্তার অধিকারের প্রশ্ন।

ড. কামাল হোসেন সাহেবকে আমি বিভিন্ন সময় প্রশ্ন করেছি, কেন কি কারণে সংবিধানে জাতিসত্ত্বার স্বীকৃতি দেয়া হয়নি? এখন এ কথা বললে তো চলবে না- কেউ বলেন নাই সেই সময়। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা দাবী করেছিলেন সংবিধানে এই বিষয়টি সংযোজন করার জন্য। দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে সংবিধানে সেটি সংযোজন করা হয় নাই। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সেই সংশোধনী যদি যুক্ত করা হতো তাহলে এই সমস্যা হতো না।

এটাকে আমি মনে করি জাতীয় সমস্যা হিসেবে দেখতে হবে। বাঙালী-পাহাড়ীদের দ্বন্দ্ব নয়, সাম্প্রদায়িকতার জায়গায় তৈরী করার চেষ্টা হচ্ছে। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প দিয়ে পাহাড়ী অঞ্চলকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে। সেটেলার যাদেরকে কামানের গোলা হিসেবে বসতি দেয়া হয়েছে ৮০ সালে, আমি একজনকে বলেছি, তোমার বাড়ী কোথায়? বলছে, বাংলাদেশ। আরও বলি বাড়ী কোথায়, বলে বাংলাদেশ, অথচ ভাষা বুঝে চেনা যায় তার বাড়ী বরিশালে। সে বরিশাল্যা ভাষায় কথা বলছে। বাংলাদেশ হলো তার অধিকারের জায়গা। সে শিখেই এসেছে বাংলাদেশ বললেই পার পেয়ে যাবে। শুধু বাঙালীর প্রশ্ন নয়, মুসলমানের প্রশ্নগুলো সামনে নিয়ে আসতে হচ্ছে। বিশেষ করে জামায়াতে ইসলাম, সমস্ত সেটেলার ক্যাম্পগুলোতে তাদের রীতিমত ঘাঁটি তৈরী করেছে এবং এর সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। সেখানে আর্মস আছে, টিম্বার আছে, সেখানে যুদ্ধ হয়েছে। সুতরাং এটাকে কেবলমাত্র পাহাড়ী-বাঙালীর সমস্যা হিসেবে বললে চলবে না। জাতীয় সমস্যা হিসেবে দেখতে হবে।

আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে, সেটেলারদের কি করবো? সন্তু লারমা এখানে উপস্থিত আছেন। সে সময় আমরা আলোচনা করেছি বিভিন্ন সেনা কর্মকর্তাদের সাথে তারাও মনে করেন এটা সমাধান সম্ভব। বিদেশী বিভিন্ন রাষ্ট্র, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রগুলো আমাদের প্রস্তাব দিয়েছিলেন- ৎবষড়পধঃরড়হ করতে

হবে। আমি একমত, মনে করি ৎবষড়পধঃরড়হ করা যায়। এই লোকগুলো সেখানে এসেছে রুটি-রুজির প্রশ্নে।

আরেকটা প্রশ্ন হলো সেনাশাসনের প্রশ্ন। তারা প্রশ্ন তুলছেন সিকিউরিটির প্রশ্ন। সেনাশাসন দিয়ে সিকিউরিটি দেয়া যাবে না। আমার একটা সুযোগ হয়েছিল ডিফেন্স কলেজের একটা সেশনে চেয়ার করতে। এটা আমার জন্য অনন্য ঘটনা হয়েছিল। সাধারণতঃ ড. কামাল হোসেনের মতো লোকদেরকে সেখানে ডাকা হয়। আমাদের মতো রাজনীতিকদের ডাকা হয় না। সেখানে বিদেশীও ছিল। বিষয়টা ছিল কাউন্টার ইনসারজেন্সী। সেখানে মাইনরিটি নিয়ে একটা অংশ ছিল। সেটা সেনা প্রধানের অভিমত ছিল। সেখানেও বলা হয়েছিল যে, এটা তাদের কিছু করার নেই। এটা রাজনৈতিকভাবে সমাধান করতে হবে। এটা সেনাশাসন দিয়ে সমাধান করা যাবে না।

তবু আজকে কেন হচ্ছে? এখানে মোর্তজা মায়ানমারের কথাগুলো বলেছেন। শুধু কি তারা? মোর্তজা বাকীগুলো বললেন না। কারণ তার ভয় আছে বলে আমার মনে হয়েছে। আসলে আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিবেশীরা যে অভিযোগ করে সেগুলো সেখানে আছে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি আছে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বলেছি। আমি দায়িত্ব নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বলেছি। এখানে বৈদেশিক হস্ত ক্ষেপ আছে সেকথা সেলিম বললেন। এটা কেবলমাত্র আমাদের ব্যাপারটা না। সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র আছে। এটা বিচ্ছিন্নতার সমস্যাও না।

জনসংহতি সমিতি কখনোই বিচ্ছিন্নতার কথা বলেনি। আমরা কিন্তু বলেছিলাম, তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী না। ১৯৪৮-৫০ সালে আমরা বিচ্ছিন্নতার কথা বলেছিলাম। আমাদের ঠেলতে ঠেলতে যখন সেই জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তখন আমাদেরকে বলতে হয়েছে যে, আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র চাই। এখন সন্তু লারমাকে সেই সরকার ঠেলতে ঠেলতে যদি সেই জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে বলেন, দায়ী কে হবে? রাষ্ট্রের দশমাংশ এলাকা যেখানে রয়েছে তার নিরাপত্তার প্রশ্নটি যখন আসছে প্রাজ্ঞ রাজনৈতিক নেতৃত্বে দূরদর্শিতা দিয়ে এটাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের।

এটা করতে গেলে এলাকার বিশেষ অবস্থাকে বিবেচনা করা প্রয়োজন। আজকে না ব্রিটিশ আমল থেকে সেটা বিশেষ এলাকা হিসেবে বিবেচিত। এটাকে বাদ দিয়ে হবে না। এমনকি পাকিস্তান আমলেও বিশেষ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে রাজনৈতিক মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। আদিবাসী, জাতীয় ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার কিন্তু আমিও সেলিমের সাথে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চাই কেবলমাত্র একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সরকার এলেই বিষয়াদির সমাধান হয়ে যাবে না। সাংবিধানিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, গরীব মানুষের অধিকার, জাতিগোষ্ঠীর অধিকার স্বীকার করে সেই ধরনের একটি সরকারের প্রয়োজনীয়তা আছে, ক্ষমতায় বসাতে হবে। এটা একদিনে হবে না, মামুনুর রশীদকে অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের সাথে মামুনুর রশীদকে আসতে হবে। আদিবাসীদের লড়াইয়ে তাকে দেখেছি, রাঢ়াঙ দেখেছি, রাঢ়াং দেখে উজ্জীবিত হয়েছি। পার্বত্য জনগোষ্ঠীর জন্য আরেকটি নাটক তৈরী করুন। তার মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে যাতে জিনিসটা আরও পৌঁছে যায় এ আশা আমি করছি।

আমাদের দেশে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তি বিভিন্ন পেশার, শ্রেণীর মানুষের ঐক্যবদ্ধতা এবং রাজনীতির জায়গা থেকে লড়াই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি সন্তু লারমাকে শান্তিচুক্তি অন্তত পক্ষে ৭ম বর্ষে পদার্পণ করেছে, বাতিল হয়ে যায়নি সেটাই আমাদের ভাগ্য। শান্তিচুক্তি আমাদের এগিয়ে নিতে হবে, বাস্তবায়ন করতে হবে। ধন্যবাদ সবাইকে।

জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

সম্মানিত আলোচকবৃন্দ, সুধী ও নেতৃবৃন্দ, সবাইকে আমি আমার তরফ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজ ২ ডিসেম্বর ২০০৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৭ম বর্ষপূর্তি দিবস। সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলে আজকের দিনটাকে প্রতিবাদ সমাবেশের মধ্য দিয়ে পালন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এখানেও রাজধানী ঢাকায় দিবসটিকে নানা দিক থেকে শুধু পর্যালোচনা করার জন্য নয়, একটা দিক নির্দেশনা খুঁজে পাওয়ার জন্য এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত করা হচ্ছে।

সম্মানিত আলোচকবৃন্দ যারা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন তারা সবাই এদেশের স্বনামধন্য; তাদের নানা ক্ষেত্রে অবদান আছে; তাঁদের আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা সবাই চুক্তির বাস্তবতা অনুভব করতে পেরেছি বলে আমি মনে করি। আজকের আলোচনায় যা কিছু এখানে উত্থাপিত হয়েছে আমি মনে করি আলোচনার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নের একটা দিক নির্দেশনা আবারও নতুন করে খুঁজে পেয়েছি।

আমি যে কথাটা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই সেটা হচ্ছে- ইতিমধ্যে এই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি আমাদের দেশে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে কর্মশালায়, আলোচনা সভায় আলোচিত হয়েছে, পর্যালোচিত হয়েছে এবং অনেক পরামর্শও বর্ষিত হয়েছে। আমরা আদিবাসী হিসেবে বা চুক্তির প্রত্যক্ষ ফলভোগী হিসেবে যা অনুভব করে আসছি সেটা হচ্ছে যে, আমাদের দেশে জাতীয় পর্যায়ে একদিকে নেতৃত্বের মধ্যে রয়েছে গণতন্ত্র, প্রগতিশীলতা, অসাম্প্রদায়িকতা পক্ষান্তরে আরেকটা দেখি যে, এখানে আছে তার চরম বৈপরীত্য। আজকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সেই চরম বৈপরীত্যের শিকারে পরিণত হয়ে তার অস্তিত্ব হারিয়ে যাওয়ার একটা প্রান্তিক অবস্থায় থাকতে বাধ্য হচ্ছে বলে আমি মনে করি। এমতাবস্থায় এদেশের গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল নেতৃত্বকে অধিকতর পরিমাণে এগিয়ে আসতে হবে।

আজকের আলোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, এই নেতৃত্ব আগের যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক সচেতন হয়েছেন, ঐক্যবদ্ধ সংহত হওয়ার একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন। যে সরকারের আমলে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সেই সরকার অবশ্য অনেক সময় পেয়েছিলেন এই চুক্তি বাস্তবায়নে, অনেক দিক তারা সেই সময় বাস্তবায়িত করতে পারতেন। কিন্তু সরকারের অভ্যন্তরে এবং গোটা দেশের শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে একটা বিশেষ মহল ছিল, যে মহল এই চুক্তিকে স্বাগত জানাতে পারেনি।

এক এক করে সাত বছর আমরা পেরিয়ে এসেছি। ইতিমধ্যে পার্বত্যাঞ্চলের বুকে অনেক রক্ত ঝরেছে, এখনও রক্ত ঝরছে এবং সেই রক্ত ঝরার যে প্রক্রিয়া সেটা কিন্তু সরকারের শাসকগোষ্ঠীর একটা মহলের দ্বারা হচ্ছে। সেটা প্রতিরোধের জন্য আজকে এখানে অনেক আলোচনা হয়েছে তাতে আমি ব্যক্তিগতভাবে উজ্জীবিত হতে পেরেছি; আমি অনুভব করছি যে, এখানে বিশেষ মহলের দ্বারা সৃষ্ট পার্বত্যাঞ্চলের পাহাড়ী-বাঙালী বৈষম্য, মৌলবাদকে প্রাধান্য দিয়ে শাসকগোষ্ঠী জিইয়ে রেখেছে। এটা আজকে আলোচনার মধ্য দিয়েও সার্বিকভাবে ফুটে উঠেছে বলে আমি মনে করি।

আমি উপস্থিত আমাদের সংগ্রামী বন্ধুদের, এদেশের জাতীয় নেতৃত্বের, যাঁদের পদচারণা, যাদের গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, প্রগতিশীল চিন্তাধারা নিয়ে তাদের সংগ্রামী জীবন, বৈপ্লবিক জীবনকে ধরে রেখেছেন তাদের উদ্দেশ্যে বিশেষ করে বলতে চাই যে, আজকে পার্বত্যাঞ্চলে যে সেনাশাসন 'অপারেশন উত্তরণ' চলছে, সে সেনাশাসন প্রত্যাহার করার বিষয়টা সবচেয়ে জরুরী বলে আমি মনে করি। সেনাবাহিনীর কারণে, সেনাশাসনের কারণে পার্বত্যাঞ্চলের সার্বিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত অবস্থায়, দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায়, হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় বিরাজ করছে এবং সেখানকার মানুষের মানবিক অধিকার পদদলিত হচ্ছে দিন দিন। সেজন্য আজকে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা ও

দুঃশাসনের বিপরীতে একটা গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সরকার তথা জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অনুভব করা যায়। তাদের এ আন্দোলনে আমি মনেকরি সামরিক শাসন প্রত্যাহার বিষয়টা উল্লেখযোগ্যভাবে কার্যক্রমে স্থান পাওয়া উচিত।

আমি আজকে যারা উপস্থিত আছেন, অনেক মূল্যবান সময় ব্যয় করে যারা এখানে যারা আমাদের আলোচকদের বক্তব্য শুনতে এসেছেন তাদেরকে আমি আমার পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পক্ষ থেকে, বাংলাদেশ আদিবাসী অধিকার আন্দোলনের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। যারা আলোচক হিসেবে এখানে আজকে উনাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে দীর্ঘক্ষণ ধরে, পার্বত্যাঞ্চল তথা বাংলাদেশের আদিবাসীদের বিষয় নিয়ে মূল্যবান মতামত দিয়েছেন সেজন্য তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

একদিন এই পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী-বাঙালীদের মধ্যে যে সোহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল সেদিনগুলো আজ হারিয়ে গেছে। আমি পাহাড়ে বাস করি। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে, কয়েক শত বছর আগে থেকে পাহাড়ে বাঙালীরা বসবাস করে আসছে। তাদের বর্তমান বংশধরদের সাথে বর্তমান পাহাড়ীদের মধ্যে মিল নেই; যেটা আমাদের কৈশোর জীবনে মিল ছিল। সেটা আজ হারিয়ে গেছে। আজকে দূরত্ব অনেক বেড়ে গেছে। সেই দূরত্ব ঘোচাতে হবে। আমি আমার ভাষায় বলবো সমাজ জীবন থেকে সকল প্রকারের শোষণ নিপীড়ন দূর করে যাতে এদেশের মানুষ বসবাস করতে পারে সেজন্য আমাদের সম্মিলিত সংগ্রামে, সম্মিলিত বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সবাইকে ধন্যবাদ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে

শক্তিপদ ত্রিপুরা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের ৭ম বর্ষ পূর্ণ হতে চললো। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের যে মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল সেই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আজ অবধি পূরণ হতে পারেনি। ঐতিহাসিক আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক বিশেষ শাসনব্যবস্থা কায়েম, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার মৌলিক দিক ভূমি সমস্যা সমাধান ইত্যাদি রয়ে গেছে সুদূর পরাহত।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর বিগত শেখ হাসিনা সরকার কর্তৃক চুক্তির কিছু বিষয় বাস্তবায়িত হয়েছে। বিশেষ করে চুক্তির যেসব বিষয় বা ধারাসমূহ সরকার তথা শাসকগোষ্ঠীর অনুকুল ছিল কেবল সেসব কতিপয় বিষয়সমূহ বা ধারাসমূহের অংশবিশেষ বাস্তবায়নে বিগত সরকার এগিয়ে আসে বলে বলা যেতে পারে। যেমন- চুক্তি মোতাবেক তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের আইন সংশোধন; পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের আইন প্রণয়ন ও অন্তবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন; পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা কমিটি গঠন; প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স গঠন; পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে একজন যোগ্য উপজাতীয়কে নিয়োগ, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনা, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উল্লেখিত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের আপাতঃ দিক ক্রিয়াশীল থাকলেও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে স্থানীয় দলীয় নেতা-কর্মীদের পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য পদে নিয়োগ দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে দলীয় একজন এমপিকে কেবিনেট মন্ত্রী নিয়োগ করা, টাস্ক ফোর্সে প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা প্রদান করে দলীয় একজন এমপি চেয়ারম্যান নিয়োগ করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে দলীয় একজন এমপিকে চেয়ারম্যান পদে নিয়োগকরণ ইত্যাদি দলীয় স্বার্থগত দিকগুলো ছিল অধিকতর ক্রিয়াশীল।

বস্তুতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা রাজনৈতিকভাবে সমাধানের পরিবর্তে পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী নীতি চরমভাবে পোষণ করার কারণে চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়িত হতে পারেনি। উগ্র জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িক নীতির ভিত্তিতে জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করার লক্ষ্যকে শাসকগোষ্ঠী আকঁড়ে ধরে রাখার কারণেই চুক্তির অন্যান্য মৌলিক ধারাসমূহ যেমন- সেনা, আনসার, এপিবি ও ভিডিপি'র সকল অস্থায়ী ক্যাম্প গুটিয়ে নেয়া; ভূমি কমিশনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করা; আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু ও ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের যথাযথভাবে পুনর্বাসন ও তাদের জমিজমা ফেরৎ দেয়া; স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়ন; কেবল সার্কেল চীফের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান; পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ প্রশাসন, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য বিষয়সমূহ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন করা; পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আঞ্চলিক

পরিষদের তত্ত্বাবধানে সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা; পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী ও আধা-সরকারী এবং পরিষদীয় চাকুরীসমূহে পাহাড়ীদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ করা; পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য জেলা পুলিশ (স্থানীয়) নিয়োগ করা ইত্যাদি বিষয়সমূহ অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়ে গেছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বর্তমান বিএনপি নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর শুধু পূর্ববর্তী সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই ক্ষান্ত থাকেনি, উপরন্তু নগ্নভাবে চুক্তির বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘন করে চলেছে। বিগত সরকারের চেয়ে অধিকতর আগ্রাসী ভূমিকা নিয়ে চুক্তিকে পদদলিত করে চলেছে। সেটেলার বাঙালীদের পুনর্বাসন, সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ, জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা, বহিরাগতদের পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্তকরণ, জেলা প্রশাসক কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের অস্থায়ী বাসিন্দাদের স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্রসহ চাকুরী ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান, ভূমি বেদখল, জমি বন্দোবস্তী ও ইজারা প্রদান এবং নতুন করে সেটেলারদের অনুপ্রবেশ ঘটানো ইত্যাদি কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

সারা দেশে আজ সন্ত্রাস, কালো টাকা ও পেশীশক্তির আধিপত্য চলছে। সমগ্র দেশ দুঃশাসন, দুর্নীতি ও উগ্র সাম্প্রদায়িকতায় ছেয়ে গেছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও সীমাহীন বেকারত্ব দেশের সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। দেশের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা জনগণের চাহিদা ও আশা-আকাঙ্খার ভিত্তিতে না হয়ে বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাসহ পশ্চিমা দাতাগোষ্ঠীর নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে। ফলে দেশের শিল্প-কারখানা ও অর্থনীতি দ্রুত গতিতে ভেঙ্গে পড়ছে। পক্ষান্তরে তেল, গ্যাস, চট্টগ্রাম বন্দরসহ দেশের অর্থ সম্পদকে দাতাসংস্থাসমূহের লুণ্ঠনের সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে। দেশের একের পর এক শাসকগোষ্ঠী বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাসহ বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর সেবাদাসে পরিণত হয়েছে। এহেন অবস্থায় দেশের সবচেয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আদিবাসী জনগণের উপর জুলুম-বঞ্চনা চরম আকার ধারণ করেছে। ইকো-পার্ক, বনায়ন, জরবদখল, সাম্প্রদায়িক হামলা ইত্যাদির মাধ্যমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে তাদের জায়গা-জমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে জাতিগতভাবে নির্মূলের ষড়যন্ত্র আজ চরম সীমায় পৌঁছেছে।

অপরদিকে সমগ্র দেশের শ্রমিক ও গরীব কৃষকের উপর শোষণ-নিপীড়ন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং রাজনৈতিক সন্ত্রাস, হত্যা, অপহরণ, ভূমি বেদখল, মিথ্যা মামলা ও সাম্প্রদায়িকতার করাল গ্রাসে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় চরম নিরাপত্তাহীনতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে। দেশের এহেন ক্রান্তিলগ্নে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবীতে জনসংহতি সমিতি আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতিবাদ সমাবেশ এবং ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন ও আলোচনা সভার আয়োজনের মধ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৭ম বর্ষপূর্তি পালন করতে বাধ্য হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা

(১) **জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের অস্বীকৃতি ঃ** ঐতিহাসিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ স্বায়ত্বশাসনের অধিকার নিয়ে যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসছে। কিন্তু পাকিস্তান ও অধুনা বাংলাদেশ শাসনামলে জুম্ম জনগণের এই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিটি সরকারই খর্ব করে দিয়ে চলেছে। অস্তিত্ব সংরক্ষণের লক্ষ্যে জুম্ম জনগণের এই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে সকল সরকারই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসাবে চিহ্নিত করার ষড়যন্ত্র করছে।

(২) **পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার নীতি ঃ** সরকার তথা শাসকগোষ্ঠী জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করার নীতি বাস্ত বায়ন করে আসছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চল থেকে হাজার হাজার বহিরাগতকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জুম্ম জনগণকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা ও ইসলামিক সম্প্রসারণবাদ প্রতিষ্ঠা করার ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে।

(৩) **ভূমি বেদখল ঃ** জুম্ম জনগণের ভূমি নানাভাবে বেদখল করে জাতিগত নির্মূলের ষড়যন্ত্র অব্যাহত চলছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পরও জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা, গ্রামে অগ্নিসংযোগ, হত্যা, গুম, ধর্ষণ ইত্যাদি সন্ত্রাসী তৎপরতার মাধ্যমে জুম্মদের ভূমি অব্যাহতভাবে বেদখল করা হচ্ছে।

(৪) **পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক শাসন ঃ** রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের পরিবর্তে শাসকগোষ্ঠী বরাবরই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে সামরিক উপায়ে সমাধানের নীতি পোষণ করে আসছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পরও "অপারেশন উত্তরণ" নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাশাসন ও সেনা সন্ত্রাস অব্যাহত রাখা হয়েছে।

(৫) **উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদী ও মৌলবাদী আমলাতন্ত্র ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রামে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিয়োজিত অধিকাংশ কর্মকর্তা বহিরাগত বাঙালী। এসব কর্মকর্তারা বাঙালী স্বার্থের প্রতি অত্যধিক আগ্রহী পক্ষান্তরে চরম জুম্ম স্বার্থ বিরোধী।

(৬) **সুশাসনের অনুপস্থিতি ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রামে সুশাসনের অনুপস্থিতি, দুর্নীতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বহুবিধ কর্তৃত্বের উপস্থিতি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে অত্যতম একটি প্রতিবন্ধকতা।

প্রতিবন্ধকতা নিরসনের উপায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা একটি জাতীয় সমস্যা। তাই এটাকে রাজনৈতিকভাবে সমাধানের লক্ষ্যে জুম্ম জনগণের স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সমাধানের পথ খুঁজে নিতে হবে। বলাবাহুল্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহের স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই দেশের সামগ্রিক কাঠামোকে দুর্বল করে না; বরঞ্চ অধিকতর শক্তিশালী ও গতিশীল করে তোলে। তাই এলক্ষ্যকে সামনে রেখে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়ন করা অতীব জরুরী ও অত্যাবশ্যক ঃ

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন কার্যকর করা; এলক্ষ্যে পরিষদসমূহের প্রবিধান ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং পরিষদসমূহের আওতাধীন বিষয়াবলী হস্ত ান্তর করা।

২। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাশাসনসহ সেনা, আনসার, এপিবি ও ভিডিপি'র সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা।

৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী, সাম্প্রদায়িক ও দুর্নীতিগ্রস্ত সংসদ সদস্য আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণ করা এবং তৎস্থলে চুক্তি মোতাবেক উক্ত পদে একজন যোগ্য উপজাতীয় ব্যক্তিকে নিয়োগ করা।

৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে উপজাতীয়দের মধ্য হতে একজন পূর্ণ মন্ত্রী নিয়োগ করা।

৫। চুক্তি মোতাবেক স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা ও নির্বাচন বিধিমালা প্রণয়ন করতঃ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা।

৬। ভূমি নিষ্পত্তিকল্পে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ চুক্তি মোতাবেক সংশোধন করে ভূমি কমিশন কার্যকর করা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে দেশবাসীর ভূমিকা

পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো একটি বৃহত্তর অঞ্চলকে এবং ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জনগোষ্ঠীকে সেনাশাসন এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক অগ্নিকুন্ডে রেখে কখনোই দেশের বৃহত্তর স্বার্থে মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেশের জাতীয় রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গসহ সমগ্র দেশবাসীকে গভীরভাবে ভাবতে হবে এবং এ সমস্যা সমাধানে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নিয়ে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে দেশের গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহকে অবশ্যই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। বস্তুতঃ দেশে একটা গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের পথ উন্মুক্ত হতে পারে বলে পার্বত্যবাসী মনে করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সমিতির স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের উপর প্রতিবেদন

চুক্তির প্রস্তাবনা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির প্রস্তাবনা অংশে উল্লেখ আছে যে, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত চারি খন্ড (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হলেন।

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার অব্যবহিত পর ২২ ডিসেম্বর চুক্তিটি মন্ত্রিপরিষদে পাশ হয় এবং গেজেট প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়। পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক ১৯৯৮ সালের মে মাসে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন **প্রণীত** হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত ও সরকার কর্তৃক গেজেট প্রকাশ করা হলেও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এবং জেলা ও থানা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিকট তা প্রেরণ করা হয়নি। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি- এই অজুহাত দেখিয়ে আইন-শৃঙ্খলা ও প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ চুক্তিকে উপেক্ষা করে চলেছে।

ফলশ্রুতিতে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং তিন পার্বত্য জেলার সংশ্লিষ্ট সংস্থা, কর্তৃপক্ষ ও বিভাগ হতে চুক্তি বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ বা সহযোগিতা পরিলক্ষিত হয়নি। বরঞ্চ চুক্তি ও চুক্তির

ধারাসমূহ সম্পর্কে অপব্যাখ্যা পূর্বক তা লঙ্ঘন করে কর্ম সম্পাদনের সর্বাত্মক প্রবণতা ও প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। অনুরূপভাবে সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ উক্ত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের' কথাগুলি দ্বারা সরকারী পরিকল্পনাধীনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বসতিদানকারী বাঙালী সেটেলার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিনিয়ত অনুপ্রবেশকৃত বা অনুপ্রবেশরত অস্থায়ী বাঙালী সেটেলারদেরকেও পার্বত্য চট্টগ্রামের নাগরিক বা স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে চুক্তিতে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে বলে অপব্যাখ্যা দিয়ে আগেকার মতো তাদের অনুকুলেই সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধাদি প্রদানের প্রক্রিয়া বা প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে। ফলে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং উন্নয়ন সম্পর্কিত সকল বিষয়ে জটিলতা অব্যাহত রয়েছে।

বস্তুতঃ 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের' কথা দ্বারা সাধারণভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের যারা নাগরিক বা বাসিন্দা হিসেবে বিবেচিত হবেন তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ধারা যেমন পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলের স্বীকৃতি, স্থায়ী অউপজাতীয় বাসিন্দা নির্ধারণ, স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র, স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন, পরিষদসমূহের চেয়ারম্যান-সদস্য পদে প্রার্থীর যোগ্যতা-অযোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়াবলীর সাপেক্ষেই তা বুঝানো হয়েছে। কিন্তু স্বার্থান্বেষী মহল থেকে অপব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে যে, উক্ত সকল নাগরিক বলতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত বা অবস্থানরত স্থানীয় ও অস্থানীয় সকল ব্যক্তির কথাই বুঝানো হয়েছে।

সরকারের তরফ থেকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে বার বার দাবী উত্থাপন করা সত্ত্বেও সরকার পক্ষ হতে এখনো পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

(ক) সাধারণ

❑ পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি ও এই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিধান ঃ চুক্তির ১নং ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করে এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু বিধান অনুযায়ী জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সমুন্নত রাখা ও পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

পক্ষান্তরে 'উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য'কে ক্ষুন্ন করার লক্ষ্যে সেটেলার বাঙালীদের পুনর্বাসন; সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ; জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা; বহিরাগতদের পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্তকরণ; জেলা প্রশাসক কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান; চাকুরী ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান; ভূমি বেদখল; বহিরাগতদের নিকট ভূমি বন্দোবস্তী ও ইজারা প্রদান; জুম্ম জনগণকে সংখ্যালঘু করার লক্ষ্যে নতুন করে সেটেলারদের অনুপ্রবেশ ঘটানো; তথাকথিত 'সমঅধিকার আন্দোলন' গঠনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টি ইত্যাদি কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। এছাড়া অতি সাম্প্রতিক কালে আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী আরো নতুন ২৮,০০০ বহিরাগত বাঙালী পরিবারকে রেশন প্রদান ও ১০,০০০ বহিরাগত পরিবারকে সাজেক এলাকায় পুনর্বাসনের ষড়যন্ত্র অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

❑ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী ও রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজনকরণের বিধান ঃ এই খন্ডের ২নং ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐক্যমত্য ও পালনীয়

দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজনের বিধান করা হলেও এক্ষেত্রে সরকার কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২, ভোটার তালিকা বিধিমালা ১৯৮২, পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০, খসড়া সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০০১, পার্বত্য চট্টগ্রামের এনজিও নীতিমালা সংশোধনের জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব পেশ করা হয়। কিন্তু সরকার খসড়া সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০০১ ব্যতীত এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ, বন আইন, ইউনিয়ন পরিষদ আইন, উপজেলা পরিষদ আইন ইত্যাদি আইনসমূহও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা হয়নি। ফলে চুক্তির বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐক্যমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

❑ **পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি ঃ** এই খন্ডের ৩নং ধারায় চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্যকে আহ্বায়ক এবং এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতিকে সদস্য করে একটি চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করার বিধান থাকলেও চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এখনো উক্ত কমিটি গঠিত হয়নি। উক্ত কমিটি গঠিত না হওয়ার ফলে চুক্তি বাস্তবায়নের পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া এখন সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। পক্ষান্তরে চুক্তির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণভাবে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জনাব আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত মন্ত্রীপরিষদ কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করতঃ উক্ত কমিটির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াবলী বাস্তবায়নের নামে একদিকে কালক্ষেপণ করা হচ্ছে অন্যদিকে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া অচলাবস্থায় রাখা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের এ কমিটির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তথা আঞ্চলিক পরিষদ প্রতিনিধিদলের মধ্যে ৮ (আট) বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকগুলোতে চুক্তি বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা নিরসনকল্পে চুক্তি মোতাবেক 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন- ২০০১' এর সংশোধনপূর্বক ভূমি কমিশনের কার্যক্রম শুরু করা এবং এ লক্ষ্যে ভূমি কমিশনের জনবল নিয়োগ ও অফিস স্থাপন; পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি পুনর্গঠন, ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীন জুম্ম উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স পুনর্গঠন, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্যপ্রণালী বিধিমালা চূড়ান্তকরণ; তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন বিষয়সমূহ হস্তান্তরকরণ, হর্টিকালচার সেন্টার, প্রধান তুলা উন্নয়ন বোর্ড এবং টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনষ্টিটিউট পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরকরণ; তিন পার্বত্য জেলায় জেলা ও দায়রা জজ আদালত স্থাপনকল্পে কার্যক্রম গ্রহণকরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু টাস্ক ফোর্স চেয়ারম্যান পদে শ্রী সমীরণ দেওয়ানকে নিয়োগ ছাড়া অন্য কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। এ থেকে এটা স্পষ্ট যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করার জন্য সরকারের কোন সিদ্ধান্ত নেই।

(খ) পার্বত্য জেলা পরিষদ

চুক্তির এ খন্ডে বলা হয়েছে যে, উভয়পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯,

বান্দরবন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯) এবং এর বিভিন্ন ধারাসমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হয়ে পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হয়েছে। এই বিধান মোতাবেক-

১। সরকার ১৯৯৮ সালের ১২ এপ্রিল তিনটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন এর বিলসমূহ জাতীয় সংসদে উত্থাপন করে। এসব বিলের উপর আলোচনার পর সরকার তৎকালীন এমপি এডভোকেট রহমত আলীর নেতৃত্বাধীন ১৫ সদস্য বিশিষ্ট বিশেষ কমিটির নিকট প্রেরণ করে।

২। উক্ত বিলসমূহে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে বিরোধার্থক অনেকগুলো বিষয় ছিল। এসব বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের জন্য ১৯৯৮ সালের ১৮-২০ এপ্রিল সরকার ও জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদলের মধ্যে একটি বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ২৯ এপ্রিল বিভিন্ন সংশোধনের পর বিশেষ কমিটি উক্ত বিলসমূহ আবার জাতীয় সংসদে পেশ করে। এতদসত্ত্বেও উক্ত বিলসমূহে কয়েকটি বিরোধাত্মক ধারা অন্তর্ভূক্ত থেকে যায়।

৩। অবশেষে কয়েক বিরোধাত্মক ধারা সমেত ৩, ৪, ৫ ও ৬ মে ১৯৯৮ যথাক্রমে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ(সংশোধন) আইন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন পাশ করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে উন্নয়ন সংক্রান্ত ব্যতীত অন্যান্য বিষয়সমূহ চুক্তির সাথে সংগতিপূর্ণভাবে সংশোধিত হয়।

৪। পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের অগোচরে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ভোটাধিকার সংক্রান্ত ১৮ নম্বর ধারা চুক্তির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণভাবেভাবে সংশোধন করা হয়।

৫। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা ও ভোটার তালিকা বিধিমালা এখনো প্রণীত হয়নি। ক্ষমতাসীন দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্য থেকে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান-সদস্য পদে মনোনয়ন দিয়ে অন্তর্বর্তী জেলা পরিষদসমূহ অগণতান্ত্রিকভাবে বছরের পর বছর ধরে পরিচালিত হচ্ছে। বস্তুতঃ এসব অন্তবর্তীকালীন পরিষদসমূহের জনগণের কাছে কোন দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নেই।

৬। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনসমূহ যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর করা হয় নি। পক্ষান্তরে নানাভাবে এসব আইনকে পদদলিত করা হচ্ছে। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ উল্লেখ করা গেল-

☐ **অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা নির্ধারণ ঃ** এই খন্ডের ৩ নং ধারায় বলা আছে যে, **"অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা বাসিন্দা"** বলতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন তাকে বুঝাবে।

১৯৯৮ সালে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন ১৯৯৮ প্রণয়ন কালে 'বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি' এর মধ্যে অবস্থিত 'এবং' শব্দটির পরিবর্তে 'বা' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হয়। প্রবল প্রতিবাদের মুখে অবশেষে ১৯৯৮ সালের ২৩ নং আইন দ্বারা চুক্তি মোতাবেক 'এবং' শব্দটি সন্নিবেশিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ এই ধারা ও আইনের অপব্যাখ্যা দিয়ে এর বাস্তবায়ন বা কার্যকরকরণ বিরোধিতা করছে। এছাড়া বৈধ জায়গা জমি না থাকা সত্ত্বেও পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকগণ বহিরাগতদেরকে অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে সনদপত্র প্রদান করে যাচ্ছেন এবং এর বদৌলতে বহিরাগতরা ভুমি বন্দোবস্তীসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন চাকুরী ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা

গ্রহণ করে যাচ্ছে। অপরপক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ ও স্থায়ী অউপজাতীয় বাসিন্দাদেরকে কোন কোন ক্ষেত্রে নানাভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

❑ সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান ঃ এই খন্ডের ৪নং ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের বিধান পার্বত্য জেলা পরিষদের আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হলেও কেবলমাত্র তিন সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা কার্যকর হচ্ছে না। পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনকে লঙ্ঘন করে তিন সার্কেল চীফের পাশাপাশি তিন পার্বত্য জেলা প্রশাসকরাও পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান করতে পারবেন বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে গত ২১ ডিসেম্বর ২০০০ জারীকৃত এক অফিসাদেশের পর থেকে জেলা প্রশাসক কর্তৃকও স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান করা হচ্ছে। অথচ "চার্টার অফ ডিউটিজ অফ ডেপুটি কমিশনারস্" পরিপত্রে জেলা প্রশাসকের নাগরিকত্ব সনদপত্র প্রদানের ক্ষমতা থাকলেও স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের কোন বিধান নেই।

উল্লেখ্য যে,পার্বত্য জেলা প্রশাসকগণ পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নন এমন অউপজাতীয় ব্যক্তিদেরকে স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র দিয়ে চলেছেন। উক্তরূপ সনদপত্র বিশেষতঃ চাকুরী, জমি বন্দোবস্তী বা কোটা ব্যবস্থাধীনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম ও স্থায়ী অউপজাতীয় বাসিন্দাগণ চাকুরী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধাদি হতে বরাবরই বঞ্চিত হচ্ছে পক্ষান্তরে অউপজাতীয় অস্থায়ী ব্যক্তিগণ স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র সংগ্রহের মাধ্যমে চাকুরীসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে জায়গা-জমির মালিকানাস্বত্ব লাভ করে চলেছে। এককথায় পার্বত্য চট্টগ্রামের অউপজাতীয় অস্থায়ী ব্যক্তিদেরকে স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে অধিকার প্রদানের প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা হয়েছে। এর সর্বশেষ দৃষ্টান্ত হচ্ছে ২০০৫ সালে খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের সময় অনেক অস্থানীয় অউপজাতীয় ব্যক্তি স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র সংগ্রহ করে শিক্ষকতার চাকুরী লাভ করেছে।

❑ স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন ঃ এই খন্ডের ৯নং ধারা মোতাবেক কেবলমাত্র স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে তিন পার্বত্য জেলার ভোটার তালিকা প্রণয়ণের বিধান পার্বত্য জেলা পরিষদের আইনে অর্ন্তভূক্ত করা হলেও তা কার্যকর করা হচ্ছে না। বিগত ২০০১ সালে প্রণীত ভোটার তালিকায় বাংলাদেশের সাধারণ ভোটার বিধিমালা অনুসারে বহিরাগতদেরও তালিকাভূক্ত করা হয়। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের অগোচরে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ভোটাধিকার সংক্রান্ত ১৮নং ধারা চুক্তির সাথে বিরোধাত্মকভাবে সংশোধন (২০০০ সালের ৩৩, ৩৪ ৩৫নং আইন) করা হয়। আজ অবধি তা চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা হয়নি।

বিগত ২০০০ সালে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ভোটার তালিকা বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের দাবীর মুখে উক্ত বিধিমালা চূড়ান্তকরণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং আইন মন্ত্রণালয় ভেটিং প্রদান করে। এরপর আর কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

আগামী ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়নের নিমিত্তে সহযোগিতা প্রদানের জন্য গত ৯ অক্টোবর ২০০৫ ও স্মারক নং- পাচবিম (প-১)-রাংগা/আইন-৮০/২০০০-১৫৮ মূলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহকে পত্র দেয়া হয়েছে। উক্ত পত্রে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়নের কোন কিছুই উল্লেখ নেই।

উপরন্তু উক্ত পত্রে সহযোগিতা প্রদানে ব্যর্থ হলে, শৈথিল্য প্রদর্শন করলে কিংবা অবহেলা করলে সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশ/আইন/বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে হুমকিমূলক ও অসৌজন্যমূলক ভাষা ব্যবহার করা হয়। উল্লেখ্য যে, ১৪ দল কর্তৃক ১৫ জুলাই ২০০৫ ঘোষিত নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার প্রস্তাবনায়ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে।

❑ **কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ঃ** এই খন্ডের ১৩নং ধারায় বলা হয়েছে যে, জেলা পরিষদে সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসেবে থাকবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। এই ধারা আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। কিন্তু কার্যকর করা হয়নি।

এই খন্ডের ১৪ নং ধারার (ক) উপ-ধারায় বলা আছে যে, এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করতে পারবে বলে বিধান থাকবে। (খ) নং উপ-ধারায় আরো বলা হয়েছে যে, পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবে এবং তাদেরকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখতে হবে। (গ) নং উপ-ধারায় আরো উল্লেখ আছে যে, এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলী, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করতে পারবে বলে বিধান থাকবে। এই ধারাসমূহ আইনে অন্ত র্ভূক্ত করা হয়েছে। কিন্তু যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়নি।

এ প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, জেলা প্রশাসন ও থানা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা নিরঙ্কুশভাবে অস্থানীয় ও অউপজাতীয়। স্বাভাবিকভাবে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিজেদের আমলাতান্ত্রিক একাধিপত্য বজায় রাখার স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা কার্যকরকরণের ক্ষেত্রে বিরোধিতা করে চলেছে।

❑ **উন্নয়ন প্রকল্প ও উন্নয়ন কার্যক্রম ঃ** এই খন্ডের ১৯নং ধারায় বলা হয়েছে যে, জেলা পরিষদ সরকার হতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারবে এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত ণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করবে।

১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন ১৯৯৮ প্রণয়নকালে এই ধারা যথাযথভাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। উক্ত ধারা নিম্নোক্তভাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয় ঃ

> "(২ক) ধারা ২৩ (খ) এর অধীন সরকার কর্তৃক পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্মের ব্যাপারে পরিষদ এই ধারার উপধারা (১) এর আওতায় নিজস্ব তহবিল হইতে বা সরকার প্রদত্ত অর্থ হইতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।"
>
> "(৪) পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত কোন বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।"

উল্লেখিত বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের জন্য বিগত সরকারের নিকট বার বার দাবী করা হয়। অবশেষে ২০০০ সালের ২৯, ৩০ ও ৩১নং আইন দ্বারা কেবলমাত্র প্রথমোক্ত (২ক) উপধারা চুক্তি মোতাবেক সংশোধন করা হয়। কিন্তু শেষোক্ত (৪) উপধারা সংশোধন করা হয়নি।

অপরদিকে পরিষদের আইনকে লঙ্ঘন করে একের পর এক সরকার তার দলীয় লোকজনকে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দিয়ে অগণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত করছে। এসব

মনোনীত পরিষদ বা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের জনগণের কাছে তাদের কোন দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নেই। জনগণ ও আইনের কাছে দায়বদ্ধতার পরিবর্তে তারা ঢাকার নির্দেশ মতো বা নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী পরিষদসমূহকে পরিচালিত করছে। ফলতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়ন চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে মারাত্মকভাবে বাধা সৃষ্টি করছে।

□ **পার্বত্য জেলা পুলিশ ঃ** এই খন্ডের ২৪নং ধারা মোতাবেক পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত করা ও পরিষদ তাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখার বিধান পার্বত্য জেলা পরিষদের আইনে অন্তর্ভূক্ত হলেও আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে কার্যকরী করার ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক গ্রহণ করা হয়নি। এখনো পর্যন্ত উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য জেলা পুলিশবাহিনী নিয়োগ বা গঠিত হয়নি। অপরদিকে পূর্বের মতো পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুলিশবাহিনীর বদলী, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষমতা সরাসরি প্রয়োগ করা হয়ে আসছে।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ আইনগতভাবে তিন পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু এ সকল পরিষদসমূহকে উপেক্ষা করে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে চলেছে। এর ফলে পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও সমন্বিত তত্ত্বাবধানে বিঘ্ন ঘটছে। ফলতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলা, চাঁদাবাজি, অপহরণ, হত্যা ইত্যাদি সন্ত্রাসী তৎপরতা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উত্তরোত্তর অবনতি ঘটছে। এমনকি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার মাধ্যমে জুম্মদের উৎখাত করে ভূমি বেদখলের প্রক্রিয়ার জোরদার হয়েছে।

□ **ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জেলা পরিষদের এখতিয়ার ঃ** এই খন্ডের ২৬নং ধারা মোতাবেক পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর না করা এবং পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর না করার বিধান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও তা যথাযথভাবে কার্যকর করা হচ্ছে না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে পূর্বানুমোদন গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

'ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা' পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন। কিন্তু আজ অবধি উক্ত বিষয় ও ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদে যথাযথভাবে হস্তান্তর করা হয়নি। অপরদিকে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি অনুসরণে জেলা প্রশাসকগণ নামজারী, অধিগ্রহণ, ইজারা ও বন্দোবস্ত প্রদান প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছেন। বনায়ন ও সেটেলার গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ এবং সেনা ক্যাম্প, গ্যারিসন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও সম্প্রসারণের নামে হাজার হাজার একর জমি জবরদখল চলছে।

বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিশেষ করে লামা, আলিকদম, নাক্ষ্যংছড়ি ও বান্দরবান সদর উপজেলায় প্রায় দু' হাজারের অধিক অস্থানীয় লোককে রাবার প্লান্টেশন ও হর্টিকালচারের নামে জনপ্রতি পঁচিশ একর করে সর্বমোট ৫০,০০০ হাজার একরের বেশী ভূমি লীজ দেয়া হয়েছে।

সরকার একতরফাভাবে বনায়নের নামে ২,১৮,০০০ একর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। তন্মধ্যে কেবলমাত্র বান্দরবন জেলায় রয়েছে ৭২,০০০ একর জমি। এর ফলে পার্বত্য

চট্টগ্রামের সবচেয়ে সংখ্যালঘু ও সুযোগ বঞ্চিত খিয়াং জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা নিজ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে। বংশ পরম্পরায় জুম চাষ ও বসতি করে আসা জমিতে এখন পরবাসী হয়ে পড়েছে।

পক্ষান্তরে রুমা সেনাবাহিনী গ্যারিসন স্থাপনের জন্য ৯,৫৬০ একর, বান্দরবন সদর ব্রিগেড সম্প্রসারণের নামে ১৮৩ একর, আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের নামে ৩০,০০০ একর, বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ২৬,০০০ একর, পানছড়ি জোন সম্প্রসারণের জন্য ১৪৭ একর এবং লংগদু জোন সম্প্রসারণের জন্য ৫০ একর জমি সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ছাড়াই অধিগ্রহণের জন্য সেনাবাহিনী তথা সরকার পক্ষ উদ্যোগ নিয়েছে। তন্মধ্যে ১১,৪৪৬ একর জমি আর্টিলারী প্রশিক্ষণের জন্য ইতিমধ্যেই জবর দখল করা হয়েছে।

❑ **পরিষদের বিশেষ অধিকার ঃ** এই খন্ডের ২৮নং ধারায় বলা হয়েছে যে, পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাবে। অধিকন্তু ২৯নং ধারায় বলা হয়েছে যে, এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করতে পারবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করার বিশেষ অধিকার থাকবে। ৩২নং ধারায় আরো বলা হয়েছে যে, পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করে আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করতে পারবে এবং সরকার এই আবেদন আনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

এই ধারাসমূহ আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আইনের এই ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করা থেকে সরকার বিরত রয়েছে।

❑ **পরিষদের আওতাধীন বিষয়সমূহ ও উহাদের হস্তান্তর ঃ** তিন পার্বত্য জেলা জেলা পরিষদসমূহকে অধিকতর শক্তিশালীকরণের নিমিত্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে আরো নতুন ১২টি বিষয়সহ নিম্নোক্ত মোট ৩৩টি বিষয় পার্বত্য জেলা পরিষদের জেলার নিকট হস্তান্তরের বিধান রয়েছে-

[১। জেলার আইন-শৃঙ্খলা তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি সাধন;

১ক। পুলিশ (স্থানীয়);

১খ। উপজাতীয় রীতিনীতি অনুসারে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উপজাতীয় বিষয়ক বিরোধের বিচার;][১]

২। জেলায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন; উহাদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ও হিসাব নিরীক্ষণ; উহাদিগকে সহায়তা, সহযোগীতা ও উৎসাহ দান।

৩। শিক্ষা-

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) সাধারণ পাঠাগার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

---

[১] ১৯৯৮ সনের ৯নং আইন দ্বারা '১। জেলার অইন শৃংখলা সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি বিধান।' শব্দগুলির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত হয়।

(গ) ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা;
(ঘ) ছাত্রাবাস স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
(ঙ) প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ;
(চ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক মজুরী প্রদান;
(ছ) বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা;
(জ) শিশু ছাত্রদের জন্য দুগ্ধ সরবরাহ ও খাদ্যের ব্যবস্থা;
(ঝ) গরীব ও দুঃস্থ ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে বা হ্রাসকৃত মূল্যে পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ;
(ঞ) পাঠ্য পুস্তক ও শিক্ষা সামগ্রী বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ[;][২]
[(ট) বৃত্তিমূলক শিক্ষা;
(ঠ) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা;
(ড) মাধ্যমিক শিক্ষা।][৩]

৪। স্বাস্থ্য-
(ক) হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র ও ডিসপেনসারী স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
(খ) ভ্রাম্যমান চিকিৎসক দল গঠন, চিকিৎসা সাহায্য প্রদানের জন্য সমিতি গঠনে উৎসাহ দান;
(গ) ধাত্রী প্রশিক্ষণ;
(ঘ) ম্যালেরিয়া ও সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
(ঙ) পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
(চ) স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিদর্শন;
(ছ) কম্পাউন্ডার, নার্স এবং অন্যান্য চিকিৎসা কর্মীর কার্য পরিদর্শন;
(জ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫। জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং তৎসম্পর্কিত কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; জনস্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষার প্রস্তাব।

৬। কৃষি ও বন-
(ক) কৃষি উন্নয়ন ও কৃষি খামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
(খ) সরকার কর্তৃক [*][৪] রক্ষিত নয় এই প্রকার বন সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ;
(গ) উন্নত কৃষি পদ্ধতি জনপ্রিয়করণ, উন্নতসকৃষি যন্তপাতি সংরক্ষণ ও কৃষকগণকে উক্ত যন্তপাতি ধারে প্রদান;
(ঘ) পতিত জমি চাষের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
(ঙ) গ্রামাঞ্চলে বনভূমি সংরক্ষণ;
(চ) কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কোন ব্যাঘাত না ঘটাইয়া বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত এবং কৃষিকার্য্যে ব্যবহার্য্য পানি সরবরাহ, জমানো ও নিয়ন্ত্রণ;
(ছ) কৃষি শিক্ষার উন্নয়ন;
(জ) ভূমি সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার এবং জলাভূমির পানি নিষ্কাশন;
(ঝ) শষ্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ, ফসলের নিরাপত্তা বিধান, বপনের উদ্দেশ্যে বীজের ঋণদান, রাসায়নিক সার বিতরণ এবং উহার ব্যবহার জনপ্রিয়করণ;
(ঞ) রাস্তার পার্শ্বে ও জনসাধারণের ব্যবহার্য্য স্থানে বৃক্ষ রোপন ও উহার সংরক্ষণ।

৭। পশু পালন-

---

[২] ১৯৯৮ সনের ৯নং আইন দ্বারা দাঁড়ির পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হয়।
[৩] ১৯৯৮ সনের ৯নং আইন দ্বারা এসব কার্যাবলী সংযোজিত হয়।
[৪] ১৯৯৮ সনের ৯নং আইন দ্বারা 'সংরক্ষিত বা' শব্দটি বিলুপ্ত করা হয়।

(ক) পশু-পাখি উন্নয়ন;
(খ) পশু-পাখির হাসপাতাল স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
(গ) পশু খাদ্যের মজুত গড়িয়া তোলা;
(ঘ) গৃহপালিত পশুসম্পদ সংরক্ষণ;
(ঙ) চারণভূমির ব্যবস্থা ও উন্নয়ন;
(চ) পশু-পাখির ব্যাধি প্রতিরোধ ও দূরীকরণ এবং পশু-পাখির সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
(ছ) দুগ্ধপল্লী স্থাপন এবং স্বাস্থ্যসম্মত আস্তাবলের ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ;
(জ) গৃহপালিত পশু খামার স্থাপন ও সংরক্ষণ;
(ঝ) হাঁসমুরগী খামার স্থাপন ও সংরক্ষণ;
(ঞ) গৃহপালিত পশু ও হাঁসমুরগী পালন-উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;
(ট) দুগ্ধ খামার স্থাপন ও সংরক্ষণ।

৮। মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, মৎস্য খামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, মৎস্য ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ।

৯। সমবায় উন্নয়ন ও সমবায় জনপ্রিয়করণ এবং উহাতে উৎসাহ দান।

১০। শিল্প ও বানিজ্য-
(ক) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন এবং উহাতে উৎসাহ দান;
(খ) স্থানীয়ভিত্তিক বানিজ্য প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
(গ) হাট বাজার স্থাপন, নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
(ঘ) গ্রামাঞ্চলে শিল্পসমূহের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ এবং উৎপাদিত সামগ্রীর বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা;
(ঙ) গ্রামভিত্তিক শিল্পের জন্য শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
(চ) গ্রাম বিপণী স্থাপন ও সংরক্ষণ।

১১। সমাজকল্যাণ-
(ক) দুঃস্থ ব্যক্তিদের জন্য কল্যাণ সদন, আশ্রয় সদন, অনাথ আশ্রয়, এতিমখানা, বিধবা সদন এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
(খ) মৃত নিঃস্ব ব্যক্তিদের দাফন বা অন্তেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করা;
(গ) ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মাদকদ্রব্য সেবন, কিশোর অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ;
(ঘ) জনগণের মধ্যে সামাজিক, নাগরিক এবং দেশপ্রেমমূলক গুণাবলীর উন্নয়ন;
(ঙ) দরিদ্রদের জন্য আইনের সাহায্য (লিগ্যাল এইড) সংগঠন;
(চ) সালিশী ও আপোষের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;
(ছ) দুঃস্থ ছিন্নমূল পরিবারের সাহায্য ও পুনর্বাসন;
(জ) সমাজকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়নমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

১২। সংস্কৃতি-
(ক) সাধারণ ও উপজাতীয় সংস্কৃতিমূলক কর্মকান্ড সংগঠন ও উহাতে উৎসাহ দান;
(খ) জনসাধারণের জন্য ক্রীড়া ও খেলাধূলার উন্নয়ন;
(গ) জনসাধারণের ব্যবহার্য্য স্থানে রেডিওর ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ;
(ঘ) যাদুঘর ও আর্ট গ্যালারী স্থাপন ও প্রদর্শনীর সংগঠন;
(ঙ) পাবলিক হল ও কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা এবং জনসভার জন্য স্থানের ব্যবস্থা;

(চ) নাগরিক শিক্ষার প্রসার এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও প্রনর্গঠন, স্বাস্থ্য, সমাজ উন্নয়ন, কবি, শিক্ষা, গবাদিপশু প্রজনন সম্পর্কীত এবং জনস্বার্থ সম্পর্কীত অন্যান্য বিষয়ের উপর তথ্য প্রচার;

(ছ) জাতীয় দিবস ও উপজাতীয় উৎসবাদি উদ্‌যাপন;

(জ) বিশিষ্ট অতিথিগণের অভ্যর্থনা;

(ঝ) শরীরচর্চার উন্নয়ন, খেলাধূলায় উৎসাহ দান এবং সমাবেশ ও প্রতিযোগীতামূলক ক্রীড়া ও খেলাধূলার ব্যবস্থা করা;

(ঞ) স্থানীয় এলাকায় ঐতিহাসিক এবং আদি বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষণ;

(ট) তথ্য কেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঠ) সংস্কৃতি উন্নয়নমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা।

১৩। সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত নহে এই প্রকার জনপথ, কালভার্ট ও ব্রীজের নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন।

১৪। সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের রক্ষণাবেক্ষণে নহে এমন খেয়াঘাট ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ।

১৫। জনসাধারণের ব্যবহার্য্য উদ্যান, খেলার মাঠ ও উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা ও উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণ।

১৬। সরাইখানা, ডাকবাংলা এবং বিশ্রামাগার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

১৭। সরকার কর্তৃক পরিষদের উপর অর্পিত উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।

১৮। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন।

১৯। পানি নিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, রাস্তা পাকাকরণ ও অন্যান্য জনহিতকর অত্যাবশ্যক কাজকরণ।

২০। স্থানীয় এলাকার উন্নয়নকল্পে নক্সা প্রণয়ন।

২১। স্থানীয় এলাকা ও উহার অধিবাসীদের ধর্মীয়, নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি সাধনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

[২২। পুলিশ (স্থানীয়);

২৩। উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার;

২৪। ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা;

২৫। কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা;

২৬। পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;

২৭। যুব কল্যাণ;

২৮। স্থানীয় পর্যটন;

২৯। পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান;

৩০। স্থানীয় শিল্প বানিজ্যের লাইসেন্স প্রদান;

৩১। জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ;

৩২। মহাজনী কারবার;

৩৩। জুম চাষ।][৫]

---

[৫] ১৯৯৮ সনের ৯নং আইন দ্বারা সংযোজিত হয়।

উপরোক্ত অধিকাংশ বিষয় এখনো পরিষদে হস্তান্তর করা হয়নি। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি উত্তরকালে পার্বত্য জেলা পরিষদে নিকট বিষয় হস্তান্তর হয়নি। ৩৩টি বিষয়ের মধ্যে এযাবৎ নিম্নোক্ত বিষয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহ হস্তান্তর করা হয়-

১। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ
২। স্বাস্থ্য বিভাগ
৩। পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ
৪। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ
৫। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন
৬। সমবায় বিভাগ
৭। সমাজসেবা বিভাগ
৮। মৎস্য বিভাগ
৯। পশু সম্পদ বিভাগ
১০। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
১১। বাজারফান্ড প্রশাসন
১২। সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/একাডেমীর মধ্যে-
    (ক) উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট
    (খ) শিল্পকলা একাডেমী
    (গ) জেলা ক্রীড়া সংস্থা
    (ঘ) পাবলিক লাইব্রেরী
    (ঙ) জেলা রেডক্রিসেন্ট ইউনিট

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত বিভাগসমূহের কেবলমাত্র জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্ম ও বেতন-ভাতাদি জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়েছে। কিন্তু উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী এখনো ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। এছাড়া শিল্প ও বানিজ্যের মধ্যে বাজারফান্ড প্রশাসন ও বিসিক এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কেবল কর্ম ও বেতন-ভাতাদি হস্তান্ত র করা হয়েছে। উপজাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বস্তুতঃ এখনো সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে। অপরদিকে বিভিন্ন ক্ষেত্র ও উৎসাদির উপর কর, রেইট, টোল এবং ফিস আরোপের ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদের আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হলেও ইহা কার্যকর করার ক্ষমতা পরিষদসমূহকে দেওয়া হয়নি। দলীয় মনোনয়নের মাধ্যমে গঠিত অন্তবর্তী জেলা পরিষদ বলবৎ থাকার কারণে জনপ্রতিনিধিত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক প্রক্রিয়া গড়ে উঠতে পারেনি। ফলতঃ জেলা পরিষদসমূহ জেলার সার্বিক উন্নয়নে তেমন কোন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

□ পরিষদের বিশেষ অধিকার ঃ এই খন্ডের ২৯নং ধারা মোতাবেক এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করা ও কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করার বিশেষ অধিকার এবং ৩২নং ধারা মোতাবেক পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হলে পার্বত্য জেলা পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করে আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করা এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিধান আইনে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। কিন্তু আইনের এই ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন পদ্ধতি অনুসরণ থেকে সরকার

বিরত রয়েছে। অপরপক্ষে বর্তমান অন্তর্বর্তী পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ এ বিষয়ে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির এই খন্ডের ১নং ধারায় বলা হয়েছে যে, পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন) এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হবে। এই ধারা মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সংক্রান্ত বাস্তবায়িত বিষয়সমূহ-

১। ১৯৮৮ সালের ৬ মে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণীত হয়েছে।

২। ১৯৯৯ সালের ১২ মে অন্তবর্তীকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা কার্যভার গ্রহণ করেন এবং ২৭ মে অভিষেক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের যাত্রা শুরু হয়।

৩। আঞ্চলিক পরিষদ আইনে উল্লেখ রয়েছে যে, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের ভোটে আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যগণ পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে উল্লেখ রয়েছে যে, পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ দায়িত্ব পালন করবে।

৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণীত হলেও এবং সরকার কার্যবিধিমালা প্রণয়ন করে নি। এ পরিষদকে যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর করা হয় নি। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ উল্লেখ করা গেল-

❑ পার্বত্য জেলা পরিষদের বিষয়াদির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় ঃ এই খন্ডের ৯নং ধারার (ক) উপ-ধারা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় এবং অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত হিসেবে কার্যকরকরণের বিধান আঞ্চলিক পরিষদের আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হলেও পরিষদের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করার ক্ষমতা কার্যকর করা হচ্ছে না। কিন্তু সরকারের অসদিচ্ছার কারণে ও ক্ষমতা দলের দলীয়করণ নীতির ফলে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ আঞ্চলিক পরিষদকে যথাযথভাবে সহযোগিতা করা থেকে বিরত রয়েছেন।

সম্প্রতি বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের ক্ষেত্রে চরম অনিয়ম, বহিরাগত লোকদেরকে নিয়োগ, সংরক্ষিত কোটা অনুসরণ না করা ইত্যাদি বিষয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের আপত্তির মুখে জনস্বার্থে আঞ্চলিক পরিষদের তরফ থেকে তদন্ত করার উদ্যোগ নেয়ার ক্ষেত্রে বান্দরবান জেলা পরিষদ আঞ্চলিক পরিষদকে এ বিষয়ে সহযোগিতা ও তথ্য প্রদানে বিরত থাকেন। অপরদিকে পার্বত্য জেলা পরিষদের কোন বিষয়ের উপর তদন্ত বা তত্ত্বাবধান করার কোন এখতিয়ার আঞ্চলিক পরিষদের নেই বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকেও একটি আইন পরিপন্থী নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ফলতঃ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সমন্বয়ে আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় বিশেষ শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

❑ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় ঃ এই খন্ডের ৯নং ধারার (খ) উপ-ধারা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করার বিধান আঞ্চলিক পরিষদের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়েসমূহের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী এবং পৌরসভার অধিকাংশ চেয়ারম্যানগণের সাম্প্রদায়িক ও অগণতান্ত্রিক ভূমিকার কারণে এক্ষেত্রে পরিষদের আইন কার্যকবর করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই পৌরসভাসমূহও আঞ্চলিক পরিষদকে দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগে অসহযোগিতা ও বিরোধিতা করে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, ২০০০ সালে রাঙ্গামাটি পৌরসভায় কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ উঠে। আঞ্চলিক পরিষদ থেকে সমন্বয়ের উদ্যোগ নেয়া হলে রাঙ্গামাটি পৌরসভা কর্তৃপক্ষ তা অগ্রাহ্য করে। বিষয়টি সরকারের নিকট উত্থাপন করা হয়। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে কোনরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

❑ সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃংখলা ও উন্নয়নের সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান ঃ এই খন্ডের ৯নং ধারার (গ) উপ-ধারা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃংখলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধানের বিধান আঞ্চলিক পরিষদের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত বিগত সরকারের আমলে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ থেকে গত ১০ এপ্রিল ২০০১ আঞ্চলিক পরিষদ তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃংখলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করবে মর্মে পরিপত্র জারী করার পরও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপার, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এবং তিন পার্বত্য জেলা ও থানা পর্যায়ের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক পরিষদকে অগ্রাহ্য করে চলেছে। বিশেষ করে একটি কায়েমী স্বার্থান্বেষী উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী মহল হতে চুক্তি বিরোধীতাকরণে মদদ থাকায় এবং কর্মকর্তাদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার স্বার্থে উপরোক্ত আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে চলেছে।

❑ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রমসহ এনজিও কার্যাবলী সমন্বয় সাধন ঃ এই খন্ডের ৯নং ধারার (ঘ) উপ-ধারা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিওসমূহের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করার ধারা আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও কার্যকর করা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলায় দেশে বিদ্যমান অন্যান্য আইন অনুযায়ী গঠিত কমিটি ও কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। এসব ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ত্রাণ মন্ত্রণালয়, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক পরিষদকে অগ্রাহ্য করে চলেছে। ফলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রমে চরম অনিয়ম ও সমন্বয়হীনতা দেখা দিয়েছে।

পার্বত্যাঞ্চলের স্থানীয় এনজিওদের এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর রেজিস্ট্রেশন প্রদানের প্রক্রিয়ায় আঞ্চলিক পরিষদকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে না। এনজিও নীতিমালা সংশোধন না করে এবং আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদকে প্রাধান্য না দিয়ে সমতল জেলাসমূহের মত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সমন্বয় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি প্রকল্প অনুমোদন পত্রে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদের পরিবর্তে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের তত্ত্বাবধানে প্রকল্প বাস্তবায়নের নির্দেশ জারী করা হয়। এর ফলে প্রকল্প অনুমোদনে আঞ্চলিক পরিষদকে সম্পৃক্ত করা হলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অন্ধকারে থেকে যায়।

❑ **উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার ঃ** এই খন্ডের ৯নং ধারার (ঙ) উপ-ধারা মোতাবেক উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভূক্ত। আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হলেও তা কার্যকর করা হয়নি। জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় সেনা কর্তৃপক্ষ জুম্মদের সামাজিক বিচারের উপর নানাভাবে হস্তক্ষেপ করে চলেছে।

❑ **ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান ঃ** এই খন্ডের ৯নং ধারার (চ) উপ-ধারা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করার বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু কার্যকর করা হচ্ছে না।

❑ **পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উপর সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধান ঃ** এই খন্ডের ১০নং ধারা মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক আঞ্চলিক পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করা এবং উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করার বিধান রয়েছে। উক্ত বিধানের মধ্যে প্রথম অংশ আঞ্চলিক পরিষদের আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হলেও শেষাংশ আইনে সন্নিবেশ করা হয়নি। আঞ্চলিক পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অর্পিত দায়িত্ব পালন করার বিধান আইনে অন্তর্ভূক্ত হলেও উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ উক্ত আইন অবজ্ঞা করে চলেছে।

বর্তমান সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘন করে একজন অউপজাতীয় ব্যক্তিকে (বহিরাগত সেটেলার আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে) নিযুক্তি দেয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া ক্ষমতার অপব্যবহার এবং চরম অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের তহবিল আত্মসাৎ করে চলেছে। তারই নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে উগ্র সাম্প্রদায়িক ও চুক্তি পরিপন্থী কার্যক্রম জোরদার হয়েছে। তার মদদে ও প্রত্যক্ষ সহায়তায় সেটেলার বাঙালীরা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঅধিকার আন্দোলন নামে একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী সংগঠন সৃষ্টি করে পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক উম্মাদনা চালিয়ে যাচ্ছে। জনসংহতি সমিতি কোন গণতান্ত্রিক কর্মসূচী ঘোষণা করলে এই সংগঠন সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে প্রতিরোধ করার ষড়যন্ত্র চালিয়ে থাকে।

উপরোক্ত সাম্প্রদায়িক ও চুক্তি পরিপন্থী কার্যক্রম, ক্ষমতার অপব্যবহার, চরম দুর্নীতির কারণে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পার্বত্যবাসী ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড চেয়ারম্যান পদ থেকে অচিরেই অপসারণের দাবী করে আসছে। কিন্তু সরকার এখনো কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

❑ **১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ও অন্যান্য আইনের অসঙ্গতি দূরীকরণ ঃ** এই খন্ডের ১১নং ধারায় বর্ণিত আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের অসংগতি দুরীকরণ বিষয়ে সরকার পদক্ষেপ নেয়নি।

❑ **অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ ঃ** এই খন্ডের ১২নং ধারা মোতাবেক পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য ১৯৯৯ সনের মে মাসে অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় বিধি প্রবিধান প্রণীত না হওয়ার কারণে পরিষদ অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে।

❑ **পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আইন প্রণয়ন ঃ** এই খন্ডের ১৩নং ধারা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার পরামর্শ করে সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করার বিধান পরিষদের আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। আইনের এই ধারা অনুসরণ করা হচ্ছে না। পার্বত্য

চট্টগ্রাম আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার পরামর্শ গ্রহণ করা হচ্ছে না। এছাড়া পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও পাহাড়ী জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হতে পারে এরূপ আইনের পরিবর্তন বা নুতন আইন প্রণয়নের জন্য আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট সুপারিশ করা হলেও সরকার কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না।

এরমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের এনজিও নীতিমালা, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কমিশন আইন ২০০১ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী সংশোধনের জন্য প্রস্তাব পেশ করা হলেও সরকার আজ অবধি কোন চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

(ঘ) পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনস্থাপন এবং এই লক্ষ্যে পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কার্য এবং বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ এই খন্ডে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়ে একমত হয়েছেন। এই খন্ডে বর্ণিত বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে একনজরে বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা নিম্নরূপ-

১। উপজাতীয় শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তাদের অধিকাংশ অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাদি বাস্তবায়ন হলেও অধিকাংশ জমি ও ভিটেমাটি ফেরৎ দেওয়া হয়নি।

২। বিগত সরকার টাস্কফোর্সের মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণভাবে আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পরিচিহ্নিত করে। কিন্তু তাদের এখনো পুনর্বাসন হয়নি। চুক্তি লঙ্ঘন করে সেটেলার বাঙালীদেরও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে অন্তর্ভূক্তির ফলে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে।

৩। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়ার কারণে ভুমিহীনদের ভূমি বন্দোবস্তী প্রদান সম্পন্ন হয়নি।

৪। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন এর চেয়ারম্যান ও সচিব নিয়োগ করেছে। প্রণীত "পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১" ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় কমিশন কাজ করতে পারছে না। উক্ত আইনে চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক ১৯টি ধারা আজও সংশোধিত হয়নি।

৫। রাবার চাষ ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে অস্থানীয়দের নিকট বরাদ্দকৃত ভূমি ইজারা বাতিল করা হয়নি। পক্ষান্তরে চুক্তির পর অনেক ইজারা প্রদান করা হয়েছে।

৬। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রদান করেছে। কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয়। বর্তমান জোট সরকারের আমলে আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদকে পাশ কাটিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে সিংহভাগ অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়।

৭। পাহাড়ী ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোটা সংরক্ষণ রয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত। পাহাড়ী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য যথাযথ বৃত্তির ব্যবস্থা নেই।

৮। উপজাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও পৃষ্টপোষকতার ক্ষেত্রে কোন পদক্ষেপ নেই।

৯। জনসংহতি সমিতির সদস্যদের যথাযথভাবে অস্ত্র জমাদান সম্পন্ন হয়েছে। তবে সরকারের একটি বিশেষ স্বার্থান্বেষী মহল জনসংহতি সমিতি সকল অস্ত্র জমা দেয়নি বলে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

১০। জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমিতির সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদের সাধারণ ক্ষমা ও তাদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলা প্রত্যাহারের অনেকাংশে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবে সাজাপ্রাপ্ত মামলা ও সামরিক আদালতের মামলাগুলি এখনো প্রত্যাহার করা হয়নি।

১১। সরকার কতৃক জনসংহতি সমিতির সদস্যদেরকে জনপ্রতি ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। ৬৪ জন সদস্যকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করেছে। ৬৭৫ জনকে পুলিশবাহিনীতে ভর্তি করেছে। কিন্তু অপরাপর সদস্যদেরকে এখনো পর্যন্ত তাদের ঋণ মওকুফ ও দাখিলকৃত আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেনি।

১২। পাঁচ শতাধিক অস্থায়ী ক্যাম্পের মধ্যে মাত্র ৩১টি ক্যাম্প প্রত্যাহারের দলিলপত্র জনসংহতি সমিতির হস্তগত হয়েছে। কিন্তু সরকার পক্ষ দাবী করছে এযাবৎ ১৭২টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন কোন ক্যাম্প প্রত্যাহৃত হয়েছে তার কোন দলিলপত্র জনসংহতি সমিতির হস্তগত হয়নি। অপরদিকে ২০০১ সালে 'অপারেশ দাবানল'-এর পরিবর্তে 'অপারেশন উত্তরণ' জারী করে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাশাসন বলবৎ এবং সেনা ক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখা হয়েছে।

১৩। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল প্রকার চাকুরীতে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন চাকুরীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখনো বহিরাগতরা কর্মরত রয়েছে।

১৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়েছে এবং Rules of Business 2000-এর অধীনে মন্ত্রণালয়ের কর্মবন্টন তালিকা প্রণীত হয়েছে। কিন্তু জোট সরকারের আমলে পাহাড়ীদের মধ্য থেকে একজন মন্ত্রী নিয়োগ না করে প্রধানমন্ত্রীর হাতে রাখা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা কমিটি কার্যকর করা হয়নি।

নিম্নে এই খন্ডে বর্ণিত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের সবিস্তৃত বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা হলো-

☐ উপজাতীয় শরণার্থী পুনর্বাসন ঃ এই খন্ডের ১নং ধারা অনুযায়ী এবং সরকার ও শরণার্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ৯ মার্চ ১৯৯৭ তারিখে স্বাক্ষরিত ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তি মোতাবেক প্রত্যাগত শরণার্থীদের টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে অধিকাংশ অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাদি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের জমি ও ভিটেমাটি ফেরৎ দেওয়া হয়নি। তাদের জায়গা জমি ও গ্রাম এখনো সেটেলারদের দখলে থাকায় তাদের পুনর্বাসন এখনো যথাযথভাবে হতে পারেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী অবাস্তবায়িত বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

মোট প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী সংখ্যা (৬৪,৬০৯ জন)	১২,২২২ পরিবার
ধান্যজমি, বাগান-বাগিচা ও বাস্তুভিটা ফেরৎ পায়নি	৯,৭৮০ পরিবার
প্রত্যাগত শরণার্থীদের মধ্যে হালের গরুর টাকা পায়নি	৮৯০ পরিবার
স্থানান্তরিত বিদ্যালয় পূর্ববর্তী স্থানে স্থাপন করা হয়নি	৬টি বিদ্যালয়
স্থানান্তারিত বাজার পূর্ববর্তী স্থানে স্থাপন করা হয়নি ও শরণার্থীদের জমিতে নতুন বাজার স্থাপন করা হয়েছে	৫টি বাজার
সেটেলার কর্তৃক বেদখলকৃত বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দির	৭টি মন্দির
সেটেলার কর্তৃক বেদখলকৃত শরণার্থীদের গ্রাম	৪০টি
ঋণ মওকুফ করা হয়নি এমন শরণার্থীর সংখ্যা	৬৪২ জন

সরকার বিগত ২০০৩ সালে জুম্ম শরণার্থীদের রেশন সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। পরবর্তীতে জুম্ম শরণার্থীরা সরকারের এই মানবতা-বিবর্জিত ও জাতিগত বিদ্বেষী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলন করে। অবশেষে প্রবল চাপের মুখে ১৩ অক্টোবর ২০০৩ প্রধানমন্ত্রীর সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রীর অনুষ্ঠিত বৈঠকে জুম্ম শরণার্থীদের রেশন অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত

হয়। কিন্তু মাঝখানে এক বছর ধরে মাত্র অর্ধেক রেশন দেয়। এক বছরের উক্ত বকেয়া অর্ধেক রেশন আজও শরণার্থীরা পায়নি।

□ আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ঃ এই খন্ডের ১ ও ২নং ধারা মোতাবেক তিন পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পরিচিহ্নিত করে টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিধান থাকলেও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের এখনো পুনর্বাসন করা হয়নি। চুক্তিতে কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কথা বুঝানো হয়ে থাকলেও সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বসতিদানকারী সেটেলার বাঙালীদেরকেও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে গণ্য করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী এই উদ্যোগের প্রতিবাদে জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধিদ্বয় নবম সভা চলাকালে ওয়াকআউট করেন। পরবর্তীতে জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত টাস্ক ফোর্সের একাদশ সভায় একতরফাভাবে ৯০,২০৮ উপজাতীয় পরিবার এবং ৩৮,১৫৬ অউপজাতীয় সেটেলার পরিবারকে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে ঘোষণা করা হয়। অবশেষে পার্বত্যবাসীর প্রবল প্রতিবাদের মুখে তৎকালীন টাস্ক ফোর্সের কার্যক্রম প্রায় অচল হয়ে পড়ে।

১৫ মে ২০০০ তারিখের একাদশ সভায় টাস্কফোর্স একতরফাভাবে পরিচিহ্নিত আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সংখ্যা ও ঘোষিত প্যাকেজ সুবিধাদি নিম্নরূপ ঃ

জেলা	উপজাতীয় পরিবার	অউপজাতীয় পরিবার	সর্বমোট পরিবার
রাঙ্গামাটি	৩৫,৫৯৫	১৫,৫৯৫	৫১,১১১
বান্দরবান	৮,০৪৩	২৬৯	৮,৩১২
খাগড়াছড়ি	৪৬,৫৭০	২২,৩৭১	৬৮,৯৪১
সর্বমোট	৯০,২০৮	৩৮,১৫৬	১,২৮,৩১৪

প্যাকেজ সুবিধা ঃ

১) প্রতিটি উদ্বাস্তু পরিবারকে এককালীন অনুদান বাবদ ১৫,০০০.০০ (পনের হাজার) টাকা প্রদান করা যেতে পারে।

২) ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট হতে অস্ত্রবিরতির পূর্বদিন পর্যন্ত (১০-৮-৯২) যে সকল উদ্বাস্তু পরিবারের -
   (ক) ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ রয়েছে তা সুদসহ মওকুফ করা যেতে পারে।
   (খ) ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকরা উপরের ঋণসমূহের কেবলমাত্র সুদ মওকুফ করা যেতে পারে।

৩) উদ্বাস্তুদের নিজ মালিকানাধীন জমি সংক্রান্ত বিরোধ ভুমি কমিশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।

৪) আয়বর্ধন কর্মসূচীর জন্য একটি থোক বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে। উক্ত বরাদ্দ হতে তফসীল ব্যাংকের মাধ্যমে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডের জন্য সহজ শর্তে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

এ প্রেক্ষিতে ২০০০ সালের জুন মাসে জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়কের নিকট স্মারকলিপি প্রদানের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এবং বহিরাগত অউপজাতীয় সেটেলার সমস্যা নিরসন বিষয়ে নিম্নোক্ত দাবীসমূহ উত্থাপন করা হয়-

১. (ক) বহিরাগত অউপজাতীয় সেটেলারদেরকে আভ্যন্তরীণ অউপজাতীয় উদ্বাস্তু হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া বাতিল করা। এতদুদ্দেশ্যে স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ হতে টাস্ক ফোর্সের নিকট প্রেরিত ১৯-৭-৯৮ তারিখের আদেশপত্রের অউপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়টি প্রত্যাহার করা।

(খ) বহিরাগত অউপজাতীয় সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে স্থানান্তর ও পুনর্বাসন করা এবং উক্ত প্রক্রিয়া শুরু করা।

২. (ক) আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা।

(খ) বিভিন্ন থানায় বাদ পড়ে যাওয়া আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের তালিকা প্রস্তুত করা।

৩. টাস্ক ফোর্স কর্তৃক প্রস্তাবিত ৪টি প্যাকেজ সুবিধার পরিবর্তে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি কর্তৃক পেশকৃত সুযোগ-সুবিধাদির ভিত্তিতে আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য টাস্ক ফোর্স কর্তৃক প্রস্তাবিত প্যাকেজ সুবিধা অত্যন্ত কম। উক্ত ধরনের সুবিধা দিয়ে কোন অবস্থাতেই উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের প্রকৃত পুনর্বাসন সম্ভব হতে পারে না। উক্ত প্রস্তাবিত প্যাকেজ সুবিধা জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি কর্তৃক টাস্ক ফোর্সের দ্বিতীয় সভায় পেশকৃত প্রস্তাবিত সুযোগ-সুবিধাদি হতে অনেক কম। পেশকৃত উক্ত সুযোগ-সুবিধাদি হলো-

(ক) বাস্তুভিটাসহ জমিজমা ফেরৎ প্রদান করা;
(খ) ঘরবাড়ী নির্মাণ, ঢেউটিন ও অন্যান্য সামগ্রীসহ নগদ ১৫,০০০ টাকা প্রদান করা;
(গ) এককালীন অর্থ সাহায্য ১০,০০০ টাকা প্রদান করা;
(ঘ) এক বৎসরের রেশনসহ তেল, ডাল ও লবণ প্রদান করা;
(ঙ) ভূমিহীনদের ভূমি প্রদান করা;
(চ) পানীয় জলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
(ছ) সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা;
(জ) চাকুরীতে পুনর্বহাল করা ও জ্যেষ্ঠতা প্রদান করা;
(ঝ) হেডম্যানদের পুনর্বহাল করা;
(ঞ) ঋণ মওকুফ করা;
(ট) মামলা প্রত্যাহার করা।

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর জনসংহতি সমিতির দাবীর মুখে অবশেষে গত ২৯ অক্টোবর ২০০৪ সমীরণ দেওয়ানকে টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ প্রদান করে। টাস্ক ফোর্স পুনর্গঠিত হওয়ার পর এ যাবৎ ২০০৪ সালের ২২ এপ্রিল, ২৭ মে, ২৫ জুলাই এবং ২১ শে নভেম্বর এই চার বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু ও প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসনের বিষয়ে মৌলিক কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। পূর্ববর্তী টাস্ক ফোর্সের সূত্র ধরে পূর্বের মতোই সরকার পক্ষ সেটেলার বাঙালীদের আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু গণ্য করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার পক্ষের এই প্রচেষ্টার ফলে বর্তমান টাস্ক ফোর্সও পূর্বের মতো অচল হয়ে পড়েছে। ফলতঃ আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

□ ভূমিহীনদের ভূমি বন্দোবস্তী প্রদান সংক্রান্ত ঃ এই খন্ডের ৩নং ধারা মোতাবেক সরকার কর্তৃক ভূমিহীন বা দু' একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করতে পরিবার প্রতি দু' একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়ার বিধান থাকলেও সরকার পক্ষ হতে কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি।

□ ভূমি কমিশন ও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি ঃ এই খন্ডের ৪নং ধারায় বলা আছে যে, জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হয়েছে সে সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। ফ্রিঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হবে।

কিন্তু এই ধারা অনুযায়ী ল্যান্ড কমিশন গঠিত হয়েছে। কিন্তু এই কমিশন ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কাজ শুরু করেনি। উল্লেখ্য যে, এই ধারা অনুযায়ী ৩ জুন ১৯৯৯ জনাব আনোয়ারুল হক চৌধুরীকে ল্যান্ড কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি কার্যভার গ্রহণের আগে ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯ মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর ৫ এপ্রিল ২০০০ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জনাব আব্দুল করিমকে চেয়ারম্যান পদে নিযুক্তি দেওয়া হয়। তিনি ১২ জুন ২০০০ কার্যভার গ্রহণ করেন। কার্যভার গ্রহণের পর তিনি একবার মাত্র খাগড়াছড়ি জেলায় সফর করেন। তারপর তিনিও শারিরীক অসুস্থতার কারণে চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর তা রয়ে যায় ঝুলন্ত অবস্থায়। শেখ হাসিনা সরকারের আমলে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি কাজী এবায়েদুল হককে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগদানের জন্য সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু জোট সরকার ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনা ব্যতিরেকে ২৯ নভেম্বর ২০০১ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মাহমুদুর রহমানকে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে।

ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হলেও এখনো কমিশনের কাজ বা ভূমি নিষ্পত্তির কাজ শুরু হয়নি। অপরদিকে ভূমি কমিশনের সচিব হিসেবে একজন অস্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রদান এবং কমিশনের জন্য কার্যালয় স্থাপন করা ইত্যাদি বিষয় অবাস্তবায়িত রয়ে যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের প্রায় সাড়ে সাত বছর পরে গত ৮ জুন ২০০৫ খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে ভূমি কমিশনের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক সংশোধনের জন্য মত প্রকাশ করা হয়। কিন্তু আজ অবধি কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে জানা যায়নি। ফলতঃ বর্তমানে ভূমি কমিশনের কাজ অচলাবস্থায় পড়ে রয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বিগত আওয়ামী লীগ সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের ঠিক একদিন আগে ১২ জুলাই ২০০১ তড়িঘড়ি করে জাতীয় সংসদে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১' পাশ করে। এই আইন পাশ করা হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক পেশকৃত পরামর্শ ও সুপারিশমালা গ্রহণ না করেই। ফলে এই আইনে রয়ে যায় চুক্তির সাথে অনেক বিরোধাত্মক বিষয়- যা চুক্তি ও জুম্ম জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী। বিরোধাত্মক বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-

১) আইনের ২(চ) ধারাতে 'পুনর্বাসিত শরণার্থী' অর্থ বলা হয়েছে যে, '৯ই মার্চ ১৯৯৭ তারিখে ভারতের আগরতলায় সরকারের সহিত উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সম্পাদিত চুক্তির আওতায় তালিকাভূক্ত শরণার্থী'। এই বিধান দ্বারা কেবলমাত্র ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তি মোতাবেক ফিরে আসা শরণার্থীদের ভূমি বিরোধগুলো নিষ্পত্তির আওতায় পড়বে। ১৯৯২ সালে সরকার ও শরণার্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে সম্পাদিত ১৬ দফা চুক্তির আওতায় ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের ভূমি বিরোধগুলো নিষ্পত্তির আওতায় পড়বে না।

২) চুক্তিতে প্রত্যাগত পাহাড়ী শরণার্থীদের জমি-জমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হয়েছে সে সমস্ত ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান করা হয়। কিন্তু ভূমি কমিশন আইনের ৬নং ধারায় কমিশনের কার্যাবলীতে (১)(ক) উপ-ধারাতে কেবলমাত্র 'পুনর্বাসিত শরণার্থীদের ভূমি বিরোধ' নিষ্পত্তির বিধান করা হয়েছে। ফলে ২০ দফা চুক্তি মোতাবেক প্রত্যাগত শরণার্থী ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য সকল ভূমি বিরোধ অনিষ্পত্তিই থেকে যাবে।

৩) চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত 'আইন, রীতি ও পদ্ধতি' অনুযায়ী ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকরণের বিধান থাকলেও আইনের ৬(১)(খ) ধারায় কেবলমাত্র 'আইন ও রীতি' উল্লেখ করা হয়েছে।

৪) চুক্তিতে 'ফ্রিঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি)' বিরোধ নিষ্পত্তিকরণের বিধান থাকলেও ভূমি কমিশন আইনে জলেভাসা জমির কথা উল্লেখ করা হয়নি।

৫) কমিশনের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে আইনের ৭(৫) ধারায় বলা হয়েছে যে, 'চেয়ারম্যান উপস্থিত অন্যান্য সদস্যদের সহিত আলোচনার ভিত্তিতে ধারা ৬(১) এ বর্ণিত বিষয়াদিসহ উহার এখতিয়ারভুক্ত অন্যান্য বিষয়ে সর্বসম্মতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, তবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত সম্ভব না হইলে চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তই কমিশনের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে'। এ বিধান বলে কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের রাবার ষ্টাম্পে পরিণত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে চেয়ারম্যানকে স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে।

৬) কমিশনের সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে আইনের ১৩(১)(২) ধারাতে চুক্তির 'পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হবে' এই ধারা সংযোজন করা হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর যে সকল ধারা চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক, সেসকল ধারা সংশোধনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ হতে ১৯ দফা সম্বলিত সুপারিশমালা সরকারের নিকট পেশ করা হয়। উক্ত সুপারিশমালা বিবেচনার্থে গত ১২/৩/২০০২ আইন, সংসদ ও বিচার বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রণালয়ের আইন মন্ত্রী মওদুদ আহমদের উপস্থিতিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ হতে পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ও সদস্য রূপায়ণ দেওয়ান প্রতিনিধিত্ব করেন।

এই সভায় ১৮টি সুপারিশ বিষয়ে ঐক্যমত্য হয়। কিন্তু অন্য একটি সুপারিশ অর্থাৎ চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত "কাপ্তাই হ্রদের জলেভাসা জমি (ফ্রিঞ্জল্যান্ড)" এর ক্ষেত্রেও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন কর্তৃক ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করা সংক্রান্ত সুপারিশ সরকার পক্ষ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে এবং পরবর্তী এক মাসের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ হতে এ সুপারিশ বিষয়ে মতামত জানানো হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ হতে ২০০২ সালের এপ্রিল মাসে বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহকারে উক্ত সুপারিশমালার অনুকূলে মতামত প্রেরিত হয়। অতঃপর ২০০৩ সালের ২১ জানুয়ারী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মওদুদ আহমেদ-এর সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ প্রতিনিধিদলের অনুষ্ঠিত বৈঠকে উক্ত বিষয়ে ঐক্যমত্য হয়।

আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ভেটিং হয়ে যাবার পর উক্ত ভূমি কমিশন আইন প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে আঞ্চলিক পরিষদ তথা জনসংহতি সমিতি প্রতিনিধিদলের সাথে ২১ এপ্রিল ২০০৩ অনুষ্ঠিত সভায় উক্ত

ভূমি কমিশন আইন সংশোধন বিষয়ে আলোচনা উত্থাপিত হয়। কিন্তু উক্ত আইন সরকার এখনো যথাযথভাবে সংশোধন করেনি। ফলে ভূমি কমিশন কর্তৃক কাজ শুরু করা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

☐ রাবার চাষের ও অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য বরাদ্দকৃত জমির ইজারা বাতিলকরণ ঃ এই খন্ডের ৮নং ধারা মোতাবেক যে সকল অউপজাতীয় ও অস্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে যারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেননি বা জমি সঠিক ব্যবহার করেননি সে সকল জমির ইজারা বাতিল করার বিধান থাকলেও আজ অবধি তা বাস্তবায়িত হয়নি। পক্ষান্তরে ইজারা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। বিশেষতঃ বান্দরবন জেলায় জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিয়ম লঙ্ঘন করে ইজারা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

☐ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ ঃ এই খন্ডের ৯নং ধারা মোতাবেক সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ, এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা ও এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করা এবং এই অঞ্চলে পরিবেশ বিবেচনায় রেখে দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগানোর বিধান থাকলেও সরকার পর্যাপ্ত পরিমাণে ও যথাযথ পদ্ধতিতে অর্থায়ন করেনি। বর্তমান জোট সরকার তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের বাজেট অনুসারে অর্থ বরাদ্দ করেনি। অপরপক্ষে বিগত সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর সিংহভাগ অর্থ কর্তন করা হয়।

বর্তমান জোট সরকারের আমলে আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদকে পাশ কাটিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও সেনাবাহিনীকে সিংহভাগ অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়। এই অর্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটেলার বাঙালীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, জুম্মদের ভূমি বেদখল, সেটেলার বাঙালীদের সংগঠিতকরণসহ চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্তকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে শান্তকরণ প্রকল্পের ১০,০০০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্যের মাধ্যমে চুক্তি পরিপন্থী কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

পর্যটন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কার্যকর কোন আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়নি। এমনকি "স্থানীয় পর্যটন" বিষয়টি এখনো পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়নি ও এই খাতে বর্তমান জোট সরকার কোন অর্থ বরাদ্দ করছে না।

☐ কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান ঃ এই খন্ডের ১০নং ধারা মোতাবেক চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌছা পর্যন্ত সরকার কর্তৃক উপজাতীয়দের জন্য সরকারী চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখা, উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করা, বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করার বিধান রয়েছে।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাহাড়ী ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোটা সংরক্ষণ রয়েছে। তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত বলা যায়। সম্প্রতি মেডিকেল, প্রকৌশল ও কৃষি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের কোটায় ভর্তির ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম জারীকৃত 'অপারেশন উত্তরণ'-এর আওতায় সেনাবাহিনীর ছাড়পত্র গ্রহণের প্রক্রিয়া পূর্বের মতো পুনঃচালুকরণের জন্য সরকারের কাছে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। অপরদিকে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে (বিসিএস) পাহাড়ীদের কোটা সংরক্ষিত থাকলেও তা যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য কোন বৃত্তি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

উল্লেখ্য যে, বিগত সেপ্টেম্বর ২০০২ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক গঠিত শিক্ষা বিষয়ক একটি কমিটি জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের কোটা বৃদ্ধি ও যথাযথ সংরক্ষণের জন্য শিক্ষামন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপমন্ত্রীসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং স্মারকলিপি প্রদান করেন। নিম্নে উক্ত শিক্ষা বিষয়ক কমিটির কোটা সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ তুলে ধরা হলো–

(ক) নিম্নোক্ত প্রস্তাবানুসারে উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোটা বৃদ্ধি করা–

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	কোটার বর্তমান সংখ্যা	প্রস্তাবিত কোটার আসন সংখ্যা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২৫ টি	প্রতিটি বিভাগে ৩ টি
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	প্রতিটি বিভাগে ২ টি	প্রতিটি বিভাগে ৪ টি
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	১২ টি	প্রতিটি বিভাগে ৩ টি
অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়	--	প্রতিটি বিভাগে ২ টি
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)	৪টি (বিভিন্ন বিভাগে ৩ টি ও স্থাপত্য বিভাগে ১ টি	১০ টি (বিভিন্ন বিভাগে ৮ টি ও স্থাপত্য বিভাগে ২ টি।
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৩টি	প্রতিটি বিভাগে ৩ টি
মেডিকেল কলেজসমূহ	৯টি (প্রতিটি জেলায় ৩ টি করে)	১৮ টি (প্রতিটি জেলায় ৬ টি করে)
বিআইটি সমূহ	২০ টি	৩০ টি (জেলা প্রতি ১০ টি করে)
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	--	প্রতিটি বিভাগে ১ টি
কৃষি কলেজসমূহ	--	৬%
ইনষ্টিটিউট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং	১ টি	৫ টি
ইনষ্টিটিউট অফ লেদার টেকনোলজি	৫%	৬%
পলিটেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটসমূহ	--	৬%
ক্যাডেট কলেজসমূহ	--	৬%
মেরিন একাডেমী, চট্টগ্রাম	১ টি	৬%

খ) উপজাতীয় কোটার মধ্যে অধিকতর পশ্চাদপদ জাতিসত্ত্বাসমূহের অগ্রাধিকার প্রদান করা এবং ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ন্যুনতম নম্বরের অধিকারী হলে বিশেষ বিবেচনায় ভর্তির সুযোগ প্রদান করা।

গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ও পরামর্শক্রমে উপজাতীয় কোটার নীতিমালা প্রণয়ন করা।

ঘ) মেডিক্যালসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় কোটার ভর্তির ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/চট্টগ্রাম ২৪ পদাতিক ডিভিশনের অনাপত্তি সনদপত্র প্রদান ও পুলিশ ভেরিফিকেশনের নিয়ম বাতিল করা।

ঙ) বিআইটিসমূহে ভর্তি পরীক্ষার ন্যুনতম নম্বরের ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনা করা এবং উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের সকল বিভাগে ভর্তির সমান সুযোগ প্রদান করা।

চ) সাধারণ প্রতিযোগিতায় যারা উত্তীর্ণ হবে তাদেরকে কোটায় অন্তর্ভুক্ত না করে মেধা তালিকায় ভর্তি করা।

ছ) উপজাতীয় কোটায় অউপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি রোধকল্পে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন সার্কেল চীফ কর্তৃক প্রদত্ত স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র চালু করা।

জ) বিদেশে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য স্কলারশীপ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

ঝ) মেডিক্যাল, প্রকৌশল ও কৃষি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উপজাতীয় কোটায় ভর্তিসহ বিদেশে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রী বাছাই এর দায়িত্ব পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যানের হাতে হস্তান্তর করা।

কিন্তু উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

☐ **উপজাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পৃষ্টপোষকতা ঃ** এই খন্ডের ১১নং ধারা মোতাবেক আদিবাসী জুম্মদের কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যতা বজায় ও বিকাশের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। তিন পার্বত্য জেলায় উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হলেও এসব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা মন্ত্রী-ভিআইপিদের নাচ-গান পরিবেশন করা এবং কিছু সংকলন প্রকাশ করার মধ্যেই সীমিত রয়েছে। পক্ষান্তরে জুম্মদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিলুপ্তির পূর্বেকার ধারা অব্যাহত রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানের আদিবাসী নাম পরিবর্তন করে বাঙালী বা ইসলামীকরণ অব্যাহত রয়েছে। পাঠ্য-পুস্তকে ইসলামী ধারা শিক্ষা গ্রহণে জুম্ম ছাত্রছাত্রীরা বাধ্য হচ্ছে। পক্ষান্তরে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস ইত্যাদি পাঠ্য-পুস্তকে যথাযথভাবে উল্লেখ নেই; যা উল্লেখ করা হয়েছে তা অত্যন্ত বিকৃতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া জুম্মদেরকে ইসলামী কায়দায় 'জনাব' লেখতে বা সম্বোধন করতে বাধ্য করা হয়।

সেনাবাহিনী তল্লাসী অভিযানের নামে জুম্মদের উপর ধর্মীয় পরিহানি অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। বরকল উপজেলায় ফালিটাঙ্যা চুগ ভাবনা কেন্দ্র ও বাঘাইছড়ির বাগান বাড়ী (চার মাইল এলাকা) নির্মাণাধীন বৌদ্ধ মন্দিরের জায়গায় বিডিআর ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। দীঘিনালার বোয়ালখালী অনাথ আশ্রম ও মহালছড়ির বৌদ্ধ শিশুঘর অনাথ আশ্রমের জবরদখল করে সেটেলার বসতি স্থাপন। এছাড়া কালাচান মহাজন পাড়া বৌদ্ধ বিহার, বেনুবন বৌদ্ধ বিহার, উদয়চার বৌদ্ধ বিহার, ঘনমুয়া কার্বারী পাড়া বৌদ্ধ বিহার, তংঘ মহাজন পাড়া বৌদ্ধ বিহার, কৃষ্ণ দয়াল পাড়া হরি মন্দির, নোয়া পাড়া রামবাবু ঢেবা হরি মন্দির ইত্যাদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জায়গা জবরদখল করে সশস্ত্রবাহিনী ক্যাম্প স্থাপন ও সেটেলার বাঙালী বসতি প্রদান করা হয়েছে।

☐ **জনসংহতি সমিতি সদস্যদের অস্ত্র জমাদান ঃ** এই খন্ডের ১৩নং ধারা মোতাবেক সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করা হবে এবং জনসংহতি সমিতির তালিকাভূক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে পালনীয় সব কিছু বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

☐ **সাধারণ ক্ষমা ও মামলা প্রত্যাহার ঃ** এই খন্ডের ১৪নং ধারায় নির্ধারিত তারিখে জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার কর্তৃক তাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করা এবং যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করার বিধান রয়েছে। ১৬নং ধারায় জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর তাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা ও জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া জারী অথবা অনুপস্থিতকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে, অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারী

পরোয়ানা এবং হুলিয়া প্রত্যাহার করা এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করার বিধান রয়েছে।

জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমিতির কার্যকলাপে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রত্যাহার ও সাজা মওকুফ করার জন্য সমিতির পক্ষ থেকে ৬ দফায় ২৫২৪ জনের বিরুদ্ধে আনীত ৯৯৯টি মামলার তালিকা সরকারের নিকট পেশ করা হয়। তন্মধ্যে যাচাইবাছাই করে ৭২০টি মামলা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও এখনো ১১৪টি মামলা অপ্রত্যাহৃত রয়ে গেছে। এছাড়া সামরিক আদালতে দায়েরকৃত কোন মামলা প্রত্যাহার করা হয়নি। সাজাপ্রাপ্ত মামলাসমূহের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট ক্ষমার আবেদন করেছেন। কিন্তু উক্ত আবেদনগুলো বর্তমান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আটকে রয়েছে। মামলা প্রত্যাহারের খতিয়ান নিম্নে দেয়া গেল–

জেলা	মোট মামলা	প্রত্যাহৃত মামলা	অপ্রত্যাহৃত মামলা
রাঙ্গামাটি	৩৫০	২৮৫	৬৫*
খাগড়াছড়ি	৪৫১	৪০৫	৪৬
বান্দরবান	৩৮	৩০	৮
মোট	৮৪৪	৭২০	১১৪

*সাজাপ্রাপ্ত ৪৩টি মামলাসহ

অপরদিকে অনুরূপভাবে অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন কারণে কারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেপ্তার করা যাবে না বলে বিধান করা হলেও জনসংহতি সমিতির সদস্যদের নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। গত ২৫ মে ২০০৪ গুইমারা আর্টিলারী ব্রিগেডের নিয়ন্ত্রণাধীন সিন্ধুকছড়ি ক্যাম্পের লেঃ কর্ণেল আবদুর রউফ ও সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট মাহ্তাবউদ্দিন-এর নেতৃত্বে ১২ ইঞ্জিনিয়ার কোরের একদল সেনা কর্তৃক জনসংহতি সমিতির গুইমারা অফিস সংলগ্ন বাড়ী থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, পিসিপি ও যুব সমিতি ১৭ জন কর্মীকে বিনা কারণে গ্রেপ্তার করে মধ্যযুগীয় কায়দায় মারধর করা হয়। গত ২৭ মে ২০০৪ খাগড়াছড়ি থানার ওসি আবুল কালামের নেতৃত্বে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যবৃন্দ যৌথভাবে জনসংহতি সমিতির খাগড়াছড়ি জেলা অফিসে হানা দিয়ে জনসংহতি সমিতির ৩৩ জন নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার করে এবং মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত করে জেলহাজতে পাঠায়।

অতি সম্প্রতি ১৫ নভেম্বর ২০০৫ খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলায় জনসংহতি সমিতির প্রত্যাগত সদস্য সুশীল কুমার চাকমা সোহেলকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে অস্ত্র ধরিয়ে দিয়ে সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রেপ্তার করা হয়। গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৫ সন্ধ্যায় পানছড়ি সেনা জোনের অধিনায়ক মঈন চৌধুরী জনসংহতি সমিতির প্রত্যাগত সদস্য কিরণ উদয় চাকমাকে ক্যাম্পে ডেকে নিয়ে হুমকি দেয় যে, আন্দোলন করলে কি হয় তা কয়েকদিন পরে বুঝিয়ে দেবো।

গত ৬ এপ্রিল ২০০৫ মাটিরাঙ্গা জোনের মেজর বাবরের নেতৃত্বে একদল সেনাসদস্য জনসংহতি সমিতির প্রত্যাগত সদস্য অমরসিং চাকমার বাড়ী ঘেরাও করে অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, বানোয়াট অভিযোগ ও হুমকি প্রদান, হয়রানি ও নাজেহাল করে। তারও আগে ২৩ আগষ্ট ২০০৪ মাটিরাঙ্গা জোনের সেনা সদস্যরা বর্বর শারীরিক নির্যাতনে অমরসিং চাকমার একমাত্র ছেলে জিম্পু চাকমাকে (২২) হত্যা করে। গত ২৩ জানুয়ারী ২০০৫ জনসংহতি সমিতির প্রত্যাগত সদস্য শান্তি শংকর চাকমা চিপনকে ধরে নিয়ে বাঘাইছড়ির উগলছড়ি বিডিআর ক্যাম্পে অবস্থানরত সুবলং জোনের ক্যাপ্টেন মেহেদীর নেতৃত্বে একদল সেনা সদস্যরা অমানুষিকভাবে মারধর করার পর জেলহাজতে প্রেরণ করে।

❑ জনসংহতি সমিতির সদস্যদের ঋণ মওকুফ, চাকুরীতে পুনর্বহাল ও পুনর্বাসন ঃ এই খন্ডের ১৪নং ধারায় জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ করেছেন কিন্তু বিবাদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেননি তাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা, প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাদের পূর্বে সরকার বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত ছিলেন তাদেরকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা, জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকুরীতে নিয়োগ করা এবং এক্ষেত্রে তাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করার বিধান রয়েছে।

পূর্বে চাকুরীতে ছিলেন ৭৮ জন জনসংহতি সমিতির সদস্যের মধ্যে ৬৪ জনকে পুনর্বহাল করা হয়েছে। কিন্তু সরকারের নিকট বার বার আবেদন সত্ত্বেও তাদের অনুপস্থিতিকালীন সময়কে কোয়ালিফাইং সার্ভিস হিসেবে গণ্য করা, জ্যেষ্ঠতা প্রদান, বেতন স্কেল নিয়মিত করা ও সংশ্লিষ্ট ভাতাদি প্রদান বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। ফলে তারা চাকুরীতে পুনর্বহাল হলেও চরম হয়রানির শিকার হচ্ছে। অপরদিকে জনসংহতি সমিতির সদস্যদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৮ সনের জুন-জুলাই মাসে জনসংহতি সমিতি সদস্যদের দাখিলকৃত ১৪২৯টি আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প এখনো সরকার ঝুলিয়ে রেখেছে। পক্ষান্তরে সরকার জনসংহতি সমিতির ৪ জন সদস্যের মোট ২২,৭৮৩ টাকার ঋণ মওকুফের আবেদন করা হলেও এখনো বাস্তবায়িত হয়নি।

❑ সকল অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার ঃ এই খন্ডের ১৭নং ধারায় উল্লেখ আছে যে, সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমন্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলিকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হবে এবং এই লক্ষ্যে সময়-সীমা নির্ধারণ করা হবে। আইন-শৃংখলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা হবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে 'আঞ্চলিক পরিষদ' যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করতে পারবে।

এই চুক্তির স্বাক্ষরের পর বিড়ত ৮ বছরে পাঁচ শতাধিক ক্যাম্পের মধ্যে মাত্র ৩১টি ক্যাম্প প্রত্যাহারের চিঠি জনসংহতি সমিতির নিকট হস্তগত হয়েছে। পক্ষান্তরে সরকার প্রচার করছে যে, এযাবৎ ১৭২টি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন কোন ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে তা তালিকাসহ কোর চিটিপত্র জনসংহতি সমিতির হস্তগত হয়নি। সরকারের চিঠি মোতাবেক ক্যাম্প প্রত্যাহারের বিবরণ নিম্নরূপ–

পত্র	সূত্র	প্রত্যাহৃত ক্যাম্প সংখ্যা
পাচবিম(সম-১)১০৩/৯৮/৮৬ তারিখ ১৫/০৪/৯৯	সেনা সদর দপ্তর, ২০ আগষ্ট'৯৮, ৩ সেপ্টেম্বর'৯৮	১০টি
	২ মার্চ'৯৯	১টি
	২২ মার্চ'৯৯	৮টি
	২৫ মার্চ'৯৯	২টি
পাচবিম(সম-১)১০৬/৯৮/১৩০ তারিখ ১০/০৬/৯৯	--	১০টি
	মোট	৩১টি

পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সংঘাতকালীন সময়ে জারীকৃত সেনাশাসন এখনো প্রত্যাহার করা হয়নি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে সাধারণ প্রশাসনে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ ও কর্তৃত্ব অব্যাহত রয়েছে। 'অপারেশন দাবানল' এর পরিবর্তে ১ সেপ্টেম্বর ২০০১ হতে পার্বত্য চট্টগ্রামে 'অপারেশন উত্তরণ' জারী করে একপ্রকার সেনাশাসন অব্যাহত রাখা হয়েছে।

এই ধারার (খ) উপ-ধারায় আরো বলা হয়েছে যে, সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হবে। কিন্তু চুক্তির এই ধারা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। প্রত্যাহৃত ক্যাম্পের জায়গা মূল মালিক বা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়নি। উপরন্তু ক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জুম্মদের জায়গা-জমি জবরদখল করা হচ্ছে। যেমন-

১।	বিলাইছড়ি ক্যাম্প থেকে এপিবিএন সদস্যদের প্রত্যাহার করে সেনা সদস্য মোতায়েন (১৭ অক্টোবর ২০০৩); এ সময় উপজেলার সাক্রাছড়ি ক্যাম্প ও গাছকাটাছড়া ক্যাম্পেও এপিবিএন সদস্যদের প্রত্যাহার করে সেনা সদস্য মোতায়েন
২।	রুমা সেনাবাহিনী গ্যারিসন স্থাপনের জন্য ৯,৫৬০ একর জমি অধিগ্রহণ
৩।	বান্দরবন সদর ব্রিগেড সম্প্রসারণের নামে ১৮৩ একর জমি অধিগ্রহণ;
৪।	বান্দরবানে আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের নামে ৩০,০০০ একর জমি অধিগ্রহণ
৫।	বান্দরবানে বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ২৬,০০০ একর জমি অধ্রিগহণ
৬।	লংগদু জোন সম্প্রসারণের জন্য ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ
৭।	পানছড়ি জোন সম্প্রসারণের জন্য ১৪৭ একম জমি অধিগ্রহণ
৮।	মাটিরাঙ্গা উপজেলায় গোকুলসমমণি কার্বারী পাড়ায় সেনা ক্যাম্প পুনঃস্থাপন
৯।	কাউখালী উপজেলার ঘাগড়ায় ঘিলাছড়ি মুখ তালুকদার পাড়ার প্রীতি বিকাশ তালুকদার ও সাধন বিকাশ চাকমার ভূমি জবরদখল করে ক্যাম্প স্থাপন (১৬ জুন ২০০৩)
১০।	লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার লক্ষ্মীছড়ি ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডে বান্যাছোলা নামক স্থানে সেনা ক্যাম্প পুনঃস্থাপন (২০০৪)
১১।	কাউখালী উপজেলাধীন খিয়াম এলাকায় সেনা ক্যাম্প পুনঃস্থাপন
১২।	রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাসা ইউনিয়নের বেতছড়া নামক স্থানে নতুন সেনা ক্যাম্প স্থাপন (২০০৫)
১৩।	রাজস্থলী উপজেলার বাঙালহালিয়া বাজারে নতুন ক্যাম্প স্থাপন (২০০৫)

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বাহ্যতঃ সিভিল প্রশাসন বলবৎ থাকলেও অপারেশন উত্তরণের বদৌলতে কার্যতঃ সেনাবাহিনীই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। সিভিল প্রশাসনের উপর সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপের কারণেই মহালছড়ির সাম্প্রদায়িক হামলার পর কিংকর্তব্যবিমূঢ় তৎকালীন খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক বলেছিলেন, 'পাহাড়িরা অসহায়, তিনি নিরুপায়' (৪ সেপ্টেম্বর'০৩ প্রথম আলো)। এই অপ্রিয় সত্যকে প্রকাশ করায় তাকে সাথে সাথে অন্যত্র বদলি করা হয়। সম্প্রতি নাইক্ষ্যংছড়িতে অস্ত্র উদ্ধারের পর সেনাবাহিনীর একাধিপত্যের কিছু কথা পত্রিকায় সংবাদে চলে আসে। বান্দরবান জেলা পুলিশ সুপার বলেছিলেন, 'আমাকে এখানে কেউ কোন তথ্য দেয় না। দেবার প্রয়োজনও মনে করে না' (৮ সেপ্টেম্বর'০৫, জনকণ্ঠ)। পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক সংস্থা হিসেবে আঞ্চলিক পরিষদ বা পার্বত্য জেলা পরিষদকে সম্পৃক্তকরণের কথা বাদ, কেউ অবহিতকরণের তাগিদও অনুভব করে না।

এছাড়া সেনাবাহিনী কর্তৃক পার্বত্যাঞ্চলে রাত্রিকালীন চলাচল নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ জারী করা হয় (৬ আগষ্ট'০৩)। রাজনৈতিক দলের নেতৃবন্দ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের তথ্যাবলী সংগ্রহের নির্দেশ জারী করা হয় (দীঘিনালা সেনানিবাস, জুলাই'০৪)। স্কুল শিক্ষক, জুমচাষী, বোট চালক, হেডম্যান-কার্বারী, বাজার কমিটি ও ব্যবসায়ী, মৎস্য শিকারীসহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

পার্বত্যাঞ্চলে সেটেলার বাঙালীদের কাছ থেকে জমির খাজনা গ্রহণের জন্য চট্টগ্রাম সেনানিবাস থেকে তিন পার্বত্য জেলা প্রশাসককে গোপনীয় পত্র দেয়া হয়। এমনকি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে এনজিওদের তথ্যাবলীও সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় (চট্টগ্রাম সেনানিবাস স্মারক নং-১০০৩/সিএ/২১/বিবিধ/৫৯, তারিখ ২২/৪/০২)। পার্বত্য চট্টগ্রামে বানিজ্যিক মোবাইল ফোন সেন্টার বন্ধ করা হয় (বিডিনিউজ ২০ আগষ্ট)। সেনা প্রশাসনের অমতে এখানে সিভিল প্রশাসন কিছুই করতে পারে না। এভাবেই আজ সিভিল প্রশাসনের কাঁধে ভর করে পার্বত্য চট্টগ্রামে চলছে একপ্রকার সেনাশাসন।

এছাড়া সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বানচাল করা তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িক উম্মাদনাকে উস্কে দিচ্ছে। এলক্ষ্যে উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠন 'সমঅধিকার আন্দোলনে' যোগ দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও জুম্মদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার হীন উদ্দেশ্যে 'আদি ও স্থায়ী বাঙালী কল্যাণ পরিষদ'এর উপর চাপ দেয়। এ উদ্দেশ্যে গত ১৪ জুন পার্বত্য চট্টগ্রাম আদি ও স্থায়ী বাঙালী কল্যাণ পরিষদের ১৮ জন নেতৃবৃন্দকে রাঙ্গামাটি ব্রিগেডের ক্যাপ্টেন ফেরদৌস কর্তৃক তাঁর কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে শারীরিক নির্যাতন ও হয়রানি করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন রাস্তাঘাটে চেক পোষ্ট বসিয়ে সেনাবাহিনী পূর্বের মতো যাত্রীবাহী বাস লঞ্চ থেকে শুরু করে সকল প্রকার যানবাহন তল্লাসীসহ গ্রামাঞ্চলে অপারেশন অব্যাহত রেখেছে। যেমন গত মার্চে বিলাইছড়ি যাওয়ার পথে দীঘলছড়ি ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা পার্বত্য উপমন্ত্রী মণিস্বপন দেওয়ানের স্পিড বোট থামাতে বাধ্য করে। একইভাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ড. মানিক লাল দেওয়ানকে জুরাছড়ি যাওয়ার পথে ভিজেকিজিং নামক স্থানে এবং সাজেক যাওয়ার পথে চংড়াছড়ি-লেমুছড়ি নামক স্থানে থামানো হয়। এভাবে সাধারণ মানুষের অবস্থা তো দূরেই, ক্ষমতাসীন দলের মন্ত্রী-চেয়ারম্যানও সেনা তল্লাসী থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতেই সেটেলার বাঙালী জুম্মদের উপর একের পর এক সাম্প্রদায়িক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। গত ৪ এপ্রিল ১৯৯৯ সেনা সদস্য কর্তৃক বাঘাইছড়ি উপজেলার বাঘাইহাট বাজারে জুম্মদের উপর হামলা চালানো হয় এবং এতে ৫১ জন জখম হয়। ১৬ অক্টোবর ১৯৯৯ বাবুছড়া জোনের সেনা সদস্য কর্তৃক দীঘিনালার বাবুছড়া বাজারে জুম্মদের উপর হামলা চালানো হয় এবং এতে ৩ জন নিহত, ২১৬ জন আহত ও ৭৪টি জুম্ম দোকান ও ঘরবাড়ী লুটপাট ও ভাংচুর করা হয়। ১৮ মে ২০০১ সেনা ও পুলিশের উপস্থিতিতে দীঘিনালা বোয়ালখালী-মেরুং এলাকায় জুম্ম গ্রামে হামলা চালানো হয় এবং এতে ৪২টি বাড়ী ভস্মিভূত ও ১৬১টি বাড়ী ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়। ২৬ জুন ২০০১ রামগড়ে নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতিতে জুম্ম গ্রামে হামলা চালানো হয় এবং ১১০টি বাড়ী ভস্মিভূত ও ১১৭টি বাড়ী লুটপাট ও ভাংচুর করা হয়। ২৬ আগষ্ট ২০০৩ মহালছড়িতে ১৪টি জুম্ম গ্রামে হামলা করা হয় এবং এতে চার শতাধিক বাড়ী ভস্মিভূত ও লুটপাট, ২ জন জুম্মকে হত্যা ও ১০ জুম্ম নারীকে ধর্ষণ করা হয়।

'অপারেশন উত্তরণ'-এর বদৌলতে আনসার, এপিবি ও ভিডিপিসহ সেনাবাহিনী সদস্যরা পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাধে সামরিক অভিযান চালাতে পারে এবং পূর্বের মতো অবাধে গ্রেপ্তার, মারধর, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও নিপীড়ন, ধর্মীয় পরিহানি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি জুম্মস্বার্থ পরিপন্থী অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

□ সকল প্রকার চাকুরীতে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ ঃ এই খন্ডের ১৮নং ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে জুম্মদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য

চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগের বিধান থাকলেও তা যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও প্রবিধানমালায় অন্তর্ভূক্তির জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ থেকে প্রস্তাব করা হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান করা হয়। কিন্তু উক্ত বিষয় সংশ্লিষ্ট সকল বিধিমালা ও প্রবিধানমালায় এখনো অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি এবং বাস্তবক্ষেত্রেও অদ্যাবধি অনুসরণ করা হয়নি। ফলে এখানো পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন চাকুরীতে বহিরাগতরা নিয়োগ লাভ করে চলেছে।

□ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ঃ এই খন্ডের ১৯নং ধারায় বর্ণিত উপজাতীয়দের মধ্য হতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করার বিধান অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্থাপিত হয়েছে। Rules of Business অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রণীত হয়েছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে উপজাতীয়দের মধ্য হতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। এই ধারা মোতাবেক মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করার জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়।

কিন্তু বর্তমান চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য জুম্মদের মধ্য থেকে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়নি। এই ধারা লঙ্ঘন করে প্রধানমন্ত্রীর হাতে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব রাখা হয়েছে। পক্ষান্তরে উপজাতীয়দের মধ্য থেকে একজন মন্ত্রী নিয়োগ না করে একজন উপমন্ত্রী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে এই ধারা মোতাবেক এখনো উপদেষ্টা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়নি। এই ধারা মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা কমিটি গঠন না করে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠনের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কাজ মনিটরিং করা হচ্ছে।

Rules of Business অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইহার দায়িত্ব ও ক্ষমতা যথাযথভাবে পালন করতে পারছে না। মন্ত্রণালয়ের প্রায় ৯৯% জন কর্মকর্তা-কর্মচারী পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী নয়। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী তথা এতদাঞ্চলের সামগ্রিক বিষয়ে সংবেদনশীল নয়। ফলতঃ অনেক ক্ষেত্রে স্থায়ী অধিবাসী তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহত্তর স্বার্থের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে লক্ষ্য করা যায়। খাগড়াছড়ির এমপি আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার নেতৃত্বে বর্তমান জোট সরকারের একটি প্রভাবশালী উগ্র জাতীয়তাবাদী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্বেষী মহল জুম্ম জনগোষ্ঠী তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহত্তর স্বার্থ পরিপন্থী কাজে ব্যবহার করে চলেছে। এই মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত থাকার সুযোগে এই বিশেষ গোষ্ঠী পর্দার অন্তরালে এসব কলকাঠি নাড়ছে। বস্তুতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে একটি ছায়া কমিটির হাতে সকল ক্ষমতা ন্যস্ত রয়েছে বলে বিশ্বস্থ সূত্রে জানা গেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সমিতির স্বাক্ষরিত চুক্তি

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত চারি খন্ড (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হইলেন।

ক) সাধারণ

১। উভয় পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন;

২। উভয়পক্ষ এই চুক্তির আওতায় যথাশীঘ্র ইহার বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐক্যমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছেন;

৩। এই চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করিবার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হইবে।

(ক) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য	ঃ	আহ্বায়ক
(খ) এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান	ঃ	সদস্য
(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি	ঃ	সদস্য

৪। এই চুক্তি উভয়পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত ও সহি করিবার তারিখ হইতে বলবৎ হইবে। বলবৎ হইবার তারিখ হইতে এই চুক্তি অনুযায়ী উভয়পক্ষ হইতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে।

খ) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ

উভয়পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, বান্দরবন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯) এবং এর বিভিন্ন ধারাসমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হইয়াছেন ঃ

১। পরিষদের বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত "উপজাতি" শব্দটি বলবৎ থাকিবে।

২। "পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ" এর নাম সংশোধন করিয়া তদ্‌পরিবর্তে এই পরিষদ "পার্বত্য জেলা পরিষদ" নামে অভিহিত হইবে।

৩। "অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা বাসিন্দা" বলিতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন তাহাকে বুঝাইবে।

৪। ক) প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন থাকিবে। এইসব আসনের এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয়দের জন্য হইবে।

খ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা ১, ২, ৩ ও ৪ - মূল আইন মোতাবেক বলবৎ থাকিবে।

গ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৫)-এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "ডেপুটি কমিশনার" এবং "ডেপুটি কমিশনারের" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে "সার্কেল চীফ" এবং "সার্কেল চীফের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

ঘ) ৪ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে- "কোন ব্যক্তি অউপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি অউপজাতীয় হিসাবে কোন অউপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না"।

৫। ৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে যে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যপদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণের পূর্বে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন। ইহা সংশোধন করিয়া "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার" - এর পরিবর্তে "হাই কোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি" কর্তৃক সদস্যরা শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন- অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে।

৬। ৮ নম্বর ধারার চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট" শব্দগুলির পরিবর্তে "নির্বাচন বিধি অনুসারে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৭। ১০ নম্বর ধারার দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "তিন বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে "পাঁচ বৎসর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৮। ১৪ নম্বর ধারায় চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

৯। বিদ্যমান ১৭নং ধারা নিম্নে উল্লেখিত বাক্যগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভূক্ত হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেন যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন; (২) তাঁহার বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয়; (৩) কোন উপযুক্ত আদালত তাহাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষণা না করিয়া থাকেন; (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।

১০। ২০ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারায় "নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ" শব্দগুলি স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হইবে।

১১। ২৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এ পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

১২। যেহেতু খাগড়াছড়ি জেলার সমস্ত অঞ্চল মং সার্কেলের অন্তর্ভূক্ত নহে, সেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আইনে ২৬ নম্বর ধারায় বর্ণিত "খাগড়াছড়ি মং চীফ" এর পরিবর্তে "মং সার্কেলের চীফ এবং চাকমা সার্কেলের চীফ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে। অনুরূপভাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সর্কেলের চীফেরও উপস্থিত থাকার সুযোগ রাখা হইবে। একইভাবে বান্দরবান জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের সভায় যোগদান করিতে পারিবেন বলিয়া বিধান রাখা হইবে।

১৩। ৩১ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (২) এ পরিষদে সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৪। ক) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

খ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) সংশোধন তরিয়া নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হইবে ঃ "পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাঁহাদেরকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে"।

গ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলী, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৫। ৩৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখ থাকিবে।

১৬। ৩৬ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এর তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

১৭। ক) ৩৭ নম্বর ধারার (১) উপ-ধারার চতুর্থতঃ এর মূল আইন বলবৎ থাকিবে।

খ) ৩৭ নম্বর ধারার (২) উপধারা (ঘ)তে বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখিত হইবে।

১৮। ৩৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) বাতিল করা হইবে এবং উপ-ধারা (৪) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ কোন অর্থ বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ বৎসরের জন্য, প্রয়োজন হইলে, একটি বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাইবে।

১৯। ৪২ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে ঃ পরিষদ সরকার হইতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয় সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে, এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।

২০। ৪৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকার" শব্দটির পরিবর্তে "পরিষদ" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২১। ৫০, ৫১ ও ৫২ নম্বর ধারাগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান বা অনুশাসন করিতে পারিবে। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এইরূপ প্রমাণ লাভ করিয়া থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজকর্ম আইনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী, তাহা হইলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে, এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২২। ৫৩ ধারার (৩) উপ-ধারার "বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইলে" শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে "এই আইন" শব্দটির পূর্বে "পরিষদ বাতিল হইলে নব্বই দিনের মধ্যে" শব্দগুলি সন্নিবেশ করা হইবে।

২৩। ৬১ নম্বর ধারার তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের" শব্দটির পরিবর্তে "মন্ত্রণালয়ের" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৪। ক) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারাটি প্রণয়ন

করা হইবে ঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাঁহাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে।

খ) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "আপাততঃ বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে" শব্দগুলির বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে "যথা আইন ও বিধি অনুযায়ী" শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৫। ৬৩ নম্বর ধারার তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সহায়তা দান করা" শব্দগুলি বলবৎ থাকিবে।

২৬। ৬৪ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে ঃ

ক) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

খ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

গ) পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

ঘ) কাপ্তাই হ্রদের জলেভাসা (Fringe Land) জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

২৭। ৬৫ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে এবং জেলায় আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকিবে।

২৮। ৬৭ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করিবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাইবে।

২৯। ৬৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করিবার বিশেষ অধিকার থাকিবে।

৩০। ক) ৬৯ ধারার উপ-ধারা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে" শব্দগুলি বিলুপ্ত এবং তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "করিতে পারিবে" এই শব্দগুলির পরে নিম্নোক্ত অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষণ করে তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করিতে পারিবে।

খ) ৬৯ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর (জ) এ উল্লেখিত "পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পন" -- এই শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩১। ৭০ নম্বর ধারা বিলুপ্ত করা হইবে।

৩২। ৭৯ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হইলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩৩। ক) প্রথম তফসিল বর্ণিত পরিষদের কার্যাবলীর ১ নম্বর "শৃঙ্খলা" শব্দটির পরে "তত্ত্বাবধান" শব্দটি সন্নিবেশ করা হইবে।

খ) পরিষদের কার্যাবলীর ৩ নম্বরে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজন করা হইবে ঃ (১) বৃত্তিমূলক শিক্ষা, (২) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা।

গ) প্রথম তফসিলে পরিষদের কার্যাবলীর ৬(খ) উপ-ধারায় "সংরক্ষিত বা" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩৪। পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বাদির মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াবলী অন্তর্ভূক্ত হইবে ঃ

ক) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা;

খ) পুলিশ (স্থানীয়);

গ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার;

ঘ) যুব কল্যাণ;

ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;

চ) স্থানীয় পর্যটন;

ছ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান;

জ) স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান;

ঝ) কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা;

ঞ) জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ;

ট) মহাজনী কারবার;

ঠ) জুম চাষ।

৩৫। দ্বিতীয় তফশীলে বিবৃত পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিস এর মধ্যে নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্র ও উৎসাদি অন্তর্ভূক্ত হইবে ঃ

ক) অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিষ্ট্রেশন ফি;

খ) পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর;

গ) ভূমি ও দালান-কোঠার উপর হোল্ডিং কর;

ঘ) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর;

ঙ) সামাজিক বিচারের ফিস;

চ) সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর;

ছ) বনজ সম্পদের উপর রয়েলটির অংশবিশেষ;

জ) সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর;

ঝ) খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিষ্কর্ষনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র বা পাট্টা সমূহ সূত্রে প্রাপ্ত রয়েলটির অংশবিশেষ;

ঞ) ব্যবসার উপর কর;

ট) লটারীর উপর কর;

ঠ) মৎস্য ধরার উপর কর।

গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

১। পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ ইং (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন) এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইবে।

২। পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন যাহার পদমর্যাদা হইবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হইবেন।

৩। চেয়ারম্যানসহ পরিষদ ২২ (বাইশ) জন সদস্য লইয়া গঠন করা হইবে। পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্যে হতে নির্বাচিত হইবে। পরিষদ ইহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

পরিষদের গঠন নিম্নরূপ হইবে ঃ

চেয়ারম্যান	১ জন
সদস্য উপজাতীয়	১২ জন
সদস্য উপজাতীয় (মহিলা)	২ জন
সদস্য অ-উপজাতীয়	৬ জন
সদস্য অ-উপজাতীয় (মহিলা)	১ জন

উপজাতীয় সদস্যদের মধ্যে ৫ জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে, ৩ জন মার্মা উপজাতি হইতে, ২ জন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে, ১ জন মুরুং ও তনচৈঙ্গ্যা উপজাতি হইতে এবং ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চাক ও খিয়াং উপজাতি হইতে।

অ-উপজাতীয় সদস্যদের মধ্যে হইতে প্রত্যেক জেলা হইতে ২ জন করিয়া নির্বাচিত হইবেন।

উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হইতে ১ জন এবং অন্যান্য উপজাতি হইতে ১ জন নির্বাচিত হইবেন।

৪। পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন সংরক্ষিত রাখা হইবে। এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয় হইবে।

৫। পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে পরিষদের সদস্য হইবেন এবং তাঁহাদের ভোটাধিকার থাকিবে। পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার অনুরূপ হইবে।

৬। পরিষদের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর হইবে। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদ বাতিলকরণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে প্রদত্ত ও প্রযোজ্য বিষয় ও পদ্ধতির অনুরূপ হইবে।

৭। পরিষদে সরকারের যুগ্ম সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন এবং এই পদে নিযুক্তির জন্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

৮। ক) যদি পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ শূণ্য হয় তাহা হইলে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য পরিষদের অন্যান্য উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে হইতে একজন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন।

খ) পরিষদের কোন সদস্যপদ যদি কোন কারণে শূণ্য হয় তবে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তাহা পূরণ করা হইবে।

৯। ক) পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে। ইহা ছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হইলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

খ) এই পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে।

গ) তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃংখলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে।

ঘ) আঞ্চলিক পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিওদের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে।

ঙ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভূক্ত থাকিবে।

চ) পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।

১০। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন।

১১। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সনের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসংগতি আইনের মাধ্যমে দুর করা হইবে।

১২। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্ত র্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করিয়া তাহার উপর পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব দিতে পারিবেন।

১৩। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হইতে পারে এইরূপ আইনের পরিবর্তন বা

নুতন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করিতে পারিবেন।

১৪। নিম্নোক্ত উৎস হইতে পরিষদের তহবিল গঠন হইবে ঃ

ক) জেলা পরিষদের তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা;

গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান;

ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা;

চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন অর্থ;

ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

ঘ) পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনস্থাপন এবং এই লক্ষ্যে পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমাপ্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কার্য এবং বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ নিম্নে বর্ণিত অবস্থানে পৌছিয়াছেন এবং কার্যক্রম গ্রহণে একমত হইয়াছেন ঃ

১। ভারতরে ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের দেশে ফিরাইয়া আনার লক্ষ্যে সরকার ও উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ০৯ মার্চ '৯৭ইং তারিখে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী ২৮শে মার্চ '৯৭ইং হইতে উপজাতীয় শরণার্থীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে এবং এই লক্ষ্যে জনসংহতি সমিরি পক্ষ হইতে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা প্রদান করা হইবে। তিন পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করিয়া একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২। সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চুড়ান্ত করিয়া তাহাদের ভূমি রেকর্ডভূক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করিবেন।

৩। সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করিতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়া নিশ্চিত করিবেন। যদি প্রয়োজনমত জমি পাওয়া না যায় তাহা হইলে সেক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হইবে।

৪। জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হইবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেইসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হইয়াছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকিবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলিবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ্রিঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

৫। এই কমিশন নিম্নোক্ত সদস্যদের লইয়া গঠন করা হইবে ঃ

ক) অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি;

খ) সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট);

গ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি;

ঘ) বিভাগীয় কমিশার/অতিরিক্ত কমিশনার

ঙ) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট)।

৬। ক) কমিশনের মেয়াদ তিন বৎসর হইবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে।

খ) কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করিবেন।

৭। যে উপজাতীয় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন অথচ বিবাদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই সেই ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

৮। রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দ ঃ যে সকল অ-উপজাতীয় ও অ-স্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেন নাই বা জমি সঠিক ব্যবহার করেন নাই সেসকল জমির বন্দোবস্ত বাতিল করা হইবে।

৯। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিবেন। এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করিবেন এবং সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করিবেন। সরকার এই অঞ্চলে পরিবেশ বিবেচনায় রাখিয়া দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগাইবেন।

১০। কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান ঃ চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্য সরকারী চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখিবেন। উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সরকার অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করিবেন। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করিবেন।

১১। উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সচেষ্ট থাকিবেন। সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকান্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্টপোষকতা ও সহায়তা করিবেন।

১২। জনসংহতি সমিতি ইহার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আয়ত্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র ও গোলবারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

১৩। সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবেন। জনসংহতি সমিতির তালিকাভূক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী

জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হইবে।

১৪। নির্ধারিত তারিখে যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার তাহাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করিবেন। যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে সরকার ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করিয়া নিবেন।

১৫। নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে কেহ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হইলে সরকার তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন।

১৬। জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর তাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হইবে।

ক) জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যকে পুনর্বাসেনর লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এককালীন ৫০,০০০/= টাকা প্রদান করা হইবে।

খ) জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া জারী অথবা অনুপস্থিতকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাহাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং হুলিয়া প্রত্যাহার করা হইবে এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করা হইবে। জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকিলে তাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে।

গ) অনুরূপভাবে অস্ত্র সমর্পন ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন কারণে কাহারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেফতার করা যাইবে না।

ঘ) জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু বিবাদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন নাই তাহাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

ঙ) প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাহারা পূর্বে সরকার বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত ছিলেন তাহাদেরকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা হইবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকুরীতে নিয়োগ করা হইবে। এইক্ষেত্রে তাহাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করা হইবে।

চ) জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের সহায়তার জন্য সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

ছ) জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৭। ক) সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমন্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলিকদম, রুমা ও

দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হইবে এবং এই লক্ষ্যে সময়-সীমা নির্ধারণ করা হইবে। আইন-শৃংখলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

খ) সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে।

১৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হইবে। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিলে সরকার হইতে প্রেষণে অথবা নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাইবে।

১৯। উপজাতীয়দের মধ্য হইতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করিবার জন্য নিম্নে বর্ণিত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হইবে।

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী;
২) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদ;
৩) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ;
৪) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ;
৫) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ;
৬) সাংসদ, রাঙ্গামাটি;
৭) সাংসদ, খাগড়াছড়ি;
৮) সাংসদ, বান্দরবান;
৯) চাকমা রাজা;
১০) বোমাং রাজা;
১১) মং রাজা;
১২) তিন পার্বত্য জেলা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য এলাকার স্থায়ী অধিবাসী তিনজন অউপজাতীয় সদস্য।

এই চুক্তি উপরোক্তভাবে বাংলাভাষায় প্রণীত এবং ঢাকায় ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৪০৪ সাল মোতাবেক ০২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং তারিখে সম্পাদিত ও সইকৃত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে	পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে
(আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্)	**(জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা)**
আহ্বায়ক	সভাপতি
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি	পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি
বাংলাদেশ সরকার	